বংশ-পরিচয়

(দশম খণ্ড)

প্রজাপতি সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার সংকলিত।

আশ্বিন—১৩৩৬

মূল্য ১৲

প্রকাশক—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীপ্রসন্ন কুমার পাল।
"নিউ আর্য্যমিশন প্রেস"
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।

নানাগুণালঙ্কৃত দার্জ্জিলিংএ বিবিধ

সদনুষ্ঠানে অগ্রণী দেশপ্রসিদ্ধ

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে

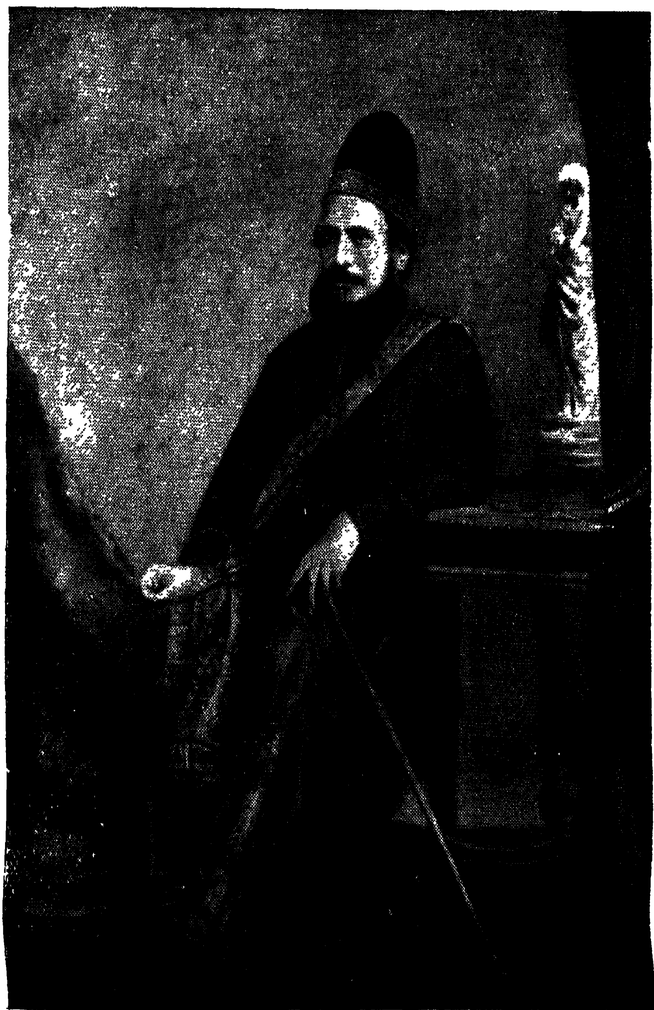
বংশ পরিচয় দশম খণ্ড

উৎসৃষ্ট হইল।



স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র



রাজা ৺ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

বংশ-পরিচয়



স্বর্গীয় রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যাঁহারা বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, রাজা ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতা নগরীতে মাতামহ ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে বাটীতে এক্ষণে শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করিতেছেন, সেই বাটীতেই দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয়। দক্ষিণারঞ্জনেরা বঙ্গদেশীয় অন্যান্য রাঢ়ীশ্রেণীর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় শ্রীহর্ষ-বংশসম্ভূত। তাঁহারা ফুলের মুখুটি গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভট্টপল্লীতে বাস করিতেন।

দক্ষিণারঞ্জনের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিজলী কাঁথির লবণ-কুঠির সদর আমীন ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পারশ্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, এই কারণে তাঁহাকে "মৌলবী মুখুয্যে" বলিয়া অনেকে সম্ভাষণ করিত। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জনের পিতা পরমানন্দ ওরফে জগন্মোহন পিরালি-বংশে সূর্য্যকুমার ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করায় ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কুলভঙ্গ হয়। পরমানন্দ কলিকাতায় জগন্মোহন-নামেই পরিচিত ছিলেন।

দুর্গাদাস নামে পরমানন্দের এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি খড়দহে বিখ্যাত গোস্বামী-বংশোদ্ভব ৺চৈতন্যচাঁদ গোস্বামীর এক পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে বাস করিতেন। জগন্মোহনের সংস্কৃত ও পারস্থ ভাষায় অসামান্য অধিকার ছিল। তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত পুঁথী প্রভৃতি এখনও তাঁহার বংশধরগণ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

দক্ষিণারঞ্জনের মাতৃপিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, পারস্থ ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ইংরাজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়পূর্ব্বক মূলাজোড়ে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবী নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদির ও অতিথিসৎকারের জন্য যথেষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে গোপীমোহন ছয় পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকুমারের পুত্র-সন্তান হয় নাই। তাঁহারই কন্যার গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয়। দক্ষিণারঞ্জনের মাতামহ সূর্য্যকুমার একটি সওদাগরী ব্যাঙ্কের প্রধান অংশী ছিলেন এবং পিতার বিস্তৃত জমিদারীরও তত্ত্বাবধান করিতেন। দক্ষিণারঞ্জনকে শিশু রাখিয়াই তাঁহার গুণময়ী মাতা স্বর্গারোহণ করেন।

দক্ষিণারঞ্জন বাল্যকালে মাতামহালয়েই স্নেহে প্রতিপালিত হন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জগন্মোহন সংস্কৃত ও পারস্থ ভাষার এবং সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা না দিলে ভবিষ্যতে পুত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না, ইহা বিবেচনা করিয়া দূরদর্শী জগন্মোহন তাঁহাকে হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন উচ্চশিক্ষা লাভার্থ হিন্দু কলেজে প্রবেশ লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় দক্ষিণারঞ্জনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব মেধা ও অদ্ভুত অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহার শিক্ষকগণ বিস্মিত হইতেন। ডেভিড হেয়ার তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। ডাক্তার উইলসনও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। স্কুলের নিম্নতর শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময় দক্ষিণারঞ্জন ইংরাজিতে এরূপ সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেন যে, ডাক্তার উইলসন তাহা লইয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তাহাদিগকে লজ্জা দিতেন। দক্ষিণারঞ্জন যখন হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তখন প্রখ্যাতনামা হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজীও কলেজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের উপর ডিরোজীওর অসাধারণ প্রভাব ছিল। ডিরোজীওর শিক্ষার ফলে দক্ষিণারঞ্জন-প্রমুখ হিন্দু ছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডিরোজীওর শিষ্যগণ ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত "একাডেমিক এসোসিয়েসনে" ডিরোজিওর তরুণ ছাত্রগণ ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন এবং জননীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রায় সার্দ্ধ এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু অর্থের প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না, তিনি দেশের কল্যাণকল্পে মুক্ত-হস্তে অর্থ দান করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইতে পারে—ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি নিজ ব্যয়ে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে "জ্ঞানান্বেষণ" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ কাল শিক্ষিত হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতারিত হইয়াছিল। প্রথম বৎসর এই পত্র বাঙ্গালা ভাষায় ও তৎপরে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয়বিধ ভাষাতে এই পত্র লিখিত হইত। এই পত্রে হিন্দু-

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা হইত এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহারেরও অনেক নিন্দাবাদ হইত, সেই কারণে দক্ষিণারঞ্জনের পিতা তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন। দক্ষিণারঞ্জন সার্কুলার রোডে তাঁহার গুরু ডিরোজীওর বাসার সন্নিকটে একটি বাসা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ঘন ঘন ডিরোজীওর বাসায় যাতায়াত করিতেন বলিয়া ডিরোজীওর ভগিনী এমিলিয়ার সহিত তাঁহার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ জনরব রটাইয়াছিল, কিন্তু সে সংবাদ সত্য নহে। কারণ, অনেকে তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দক্ষিণারঞ্জন ইতিপূর্ব্বেই হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীর সহিত ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে বাস করিবার পর দক্ষিণারঞ্জন আবার পিতার নিকট ফিরিয়া আইসেন। উত্তরকালে দক্ষিণারঞ্জনের উদ্যোগে "বেঙ্গল স্পেকটেটর" পত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়।

ডিরোজীও-প্রদত্ত শিক্ষার গুণে দক্ষিণারঞ্জন যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৈশোর-জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জনের অন্যতম বন্ধু স্বনামখ্যাত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একবার ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দক্ষিণারঞ্জন নিজ নাম গোপন করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। আর একবার ডেভিড হেয়ারের কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করেন। ডেভিড হেয়ার এই ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারেন নাই। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার নিকট মাত্র আট সহস্র মুদ্রা মূল্যের ভূমিখণ্ড গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। গো-মাংস ভক্ষণের জন্য রেভারেণ্ড (তখন রেভারেণ্ড নয়) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তখন দক্ষিণারঞ্জনই তাঁহাকে কিঞ্চিদধিক একমাসকাল

আশ্রয় দিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দক্ষিণারঞ্জনকেও তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন তাহা করেন নাই। বরং তাঁহার পিতা আশ্রিত কৃষ্ণমোহনকে কাষ্ঠ-পাদুকা-প্রহারে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া তিনিও পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, পরিশেষে আবার পিতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্যর চার্লস মেট্‌কাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা তাঁহাকে টাউন হলে অভ্যর্থিত করেন। দক্ষিণারঞ্জন সেই সভায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া মেট্‌কাফকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

ডিরোজীওর মৃত্যুর পর—একাডেমিক এসোসিয়েসনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন সেই সভায় প্রথমে যোগদান না করিলেও শেষে ইহার একজন প্রধান সভ্য হইয়াছিলেন এবং সেই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন "Present condition of the East India Company's Courts of Judicature and Police under the Bengal Presidency" শীর্ষক একটি বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বক্তৃতাই বোধ হয় দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম ও প্রধান রাজনীতিক বক্তৃতা। তখন হিন্দু কলেজেই "জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার" অধিবেশন হইত। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কাপ্তেন রিচার্ডসন সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—"I cannot convert the College into a den of a treason" অর্থাৎ "আমি কোনমতেই এই বিদ্যা-মন্দিরকে বিদ্রোহীদিগের মন্ত্রণাগারে পরিণত করিতে দিতে পারি না।" বক্তৃতাটি লইয়া সে সময়ে ইংরাজ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ মহা আন্দোলন করিয়া-

ছিলেন, কেহ কেহ বা তাঁহাকে অভদ্রোচিত কটু ভাষায় গালাগালিও দিয়াছিলেন, কিন্তু "বেঙ্গল হরকরা" পত্র তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার মতের সমর্থন করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল পার্লামেণ্টের সদস্য জর্জ্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় প্রথমে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী' প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দক্ষিণারঞ্জন তরুণ বয়সেই প্রভূত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ধনী বিলাসীর ন্যায় অলসভাবে সময় না কাটাইয়া সংবাদপত্রের সেবা ও সদর আদালতে ব্যবহারাজীবের কাজ করিতেন।

দক্ষিণারঞ্জনের সহিত হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীর বিবাহের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসুন্দরীর পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি মুক্তকেশী নাম্নী একটি মাত্র কন্যাসন্তান প্রসব করিবার কিছুকাল পরে দুশ্চিকিৎস্য মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বিধবা মহারাণী বসন্তকুমারীর সহিত বৈষয়িক সূত্রে তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলে তিনি বসন্তকুমারীকে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ করেন এবং এই অভিনব বিবাহ সর্ব্বতোভাবে বৈধ ও সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি কলিকাতার পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষীদের সম্মুখে বসন্তকুমারীর সহিত তাঁহার সিভিল-ম্যারেজ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সমাজ বসন্তকুমারীকে লইয়া চলে নাই। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পর দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীটে ৫৬ সংখ্যক ভবনে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতার কলেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে সেকালে এতদ্দেশীয়গণকে নিযুক্ত করা হইত না। এই সময়ে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি মহামনা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার

বেথুন এদেশে হিন্দুবালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে প্রয়াস পান। প্রথমে কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠক-খানায় অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। বেথুন সাহেব প্রতিদিন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। অতঃপর রাজা দক্ষিণারঞ্জন দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮৫০খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বেথুন এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রতি মাসে আটশত মুদ্রা ব্যয় করিতেন। বহুকাল দক্ষিণারঞ্জনের কোন স্মৃতি-চিহ্ন বেথুন কলেজে না থাকায় লোকে তাঁহার দানের কথা একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। গত ১৯১৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে বেথুন কলেজে দক্ষিণারঞ্জনের স্মরণার্থ একটি প্রস্তরময় স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কলেক্টরের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুস্থ হইবার পর কিছুকাল ত্রিপুরার রাজসচিবের কার্য্য করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ফরেদুন জা'র অধীনে দেওয়ান-নিজামতের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক "রাজা" ও "মাদার-উল-মাহাম" (প্রধান মন্ত্রী) উপাধি-ভূষণে ভূষিত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান-নিজামতের পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি কিছুদিন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় দক্ষিণারঞ্জন বিলাতের "টাইম্‌স্" পত্রে বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই এই উপলক্ষে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার অধিবেশন হয়।

দক্ষিণারঞ্জন সেই সভায় ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। দক্ষিণারঞ্জন রাজভক্ত হইলেও, ডিরোজীওর জীবনী-রচয়িতা মিষ্টার টমাস্ এডওয়ার্ড্‌স্ তাঁহাকে স্বার্থান্বেষী, চক্রান্তকারী ও রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু টমাস্ এডওয়াডের্র উক্তি আদৌ সত্য নহে। ইহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত। লর্ড ক্যানিংএর ন্যায় লোক তাঁহাকে কে-সি-এস্-আই উপাধিতে ভূষিত করিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহা গ্রহণ না করিয়া তালুকদারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও পদস্থ বলরামপুরের তালুকদারকে ঐ উপাধি দিতে অনুরোধ করায় তাঁহার অনুরোধমত কার্য্য হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে দক্ষিণারঞ্জন প্রধানতঃ অযোধ্যাতেই বাস করিতেন। তিনি যে স্বার্থের জন্য বা রাজকার্য্যের জন্যই স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় বাস করিতেন, তাহা নহে; তাঁহার আরও উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যা প্রদেশে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে তালুক প্রাপ্ত হন, তাহা রাণা বেণী মেধো বক্স বাহাদুরের সম্পত্তি ছিল। সিপাহীযুদ্ধের পর বিদ্রোহী রাণার দণ্ডস্বরূপ ঐ সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লন এবং দক্ষিণারঞ্জনকে প্রদান করেন। এই তালুকের কোন কোন স্থান ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং কেবল হিংস্র পশু নহে। পশু অপেক্ষা অধম ধর্ম্মহীন নরনারীর আবাসস্থান ছিল। দক্ষিণারঞ্জন সেইসকল স্থানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং প্রজাবর্গের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে "অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশে রাজপুতদিগের মধ্যে শিশু কন্যাগণকে বিনাশ করিবার এক নৃশংস প্রথা বিদ্যমান ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জনের আন্তরিক চেষ্টায় সেই প্রথা তিরোহিত হয়। "অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা" দক্ষিণারঞ্জনেরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়; অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের সুবৃহৎ কৈসর বাগ প্রাসাদটি সভার কার্য্যের জন্য লর্ড ক্যানিং দান করেন।

অযোধ্যার তালুকদার সভার মুখপত্রস্বরূপ দক্ষিণারঞ্জন "সমাচার হিন্দুস্থানী" ও "ভারত পত্রিকা" নামক দুইখানি সংবাদপত্রেরও প্রতিষ্ঠা করেন। "সমাচার হিন্দুস্থানী" ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইত। দক্ষিণারঞ্জনই উহার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসর ১৮ই আগষ্ট দক্ষিণারঞ্জনের আহ্বানে অযোধ্যায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার এক অধিবেশন হয়। দক্ষিণারঞ্জন সেই সভায় লর্ড ক্যানিংএর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক সুদীর্ঘ করুণরসাত্মক বক্তৃতা করেন। সিপাহীযুদ্ধের পর এতদ্দেশীয় ইংরাজগণ দেশীয় ভূম্যধিকারিগণকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। দক্ষিণারঞ্জন পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির হারে গাঁথিয়াছিলেন। স্যর রোপার লেথব্রিজ একস্থানে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—He did much to remove the racial antipathies between the English and the Indians.

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে অযোধ্যাবাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দক্ষিণারঞ্জনকে একটি মূল্যবান্ সুবর্ণপদক উপহার দেন।

দক্ষিণারঞ্জনেরই চেষ্টায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে আমিনাবাদ প্রাসাদে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজে

আইন পড়াইবার ব্যবস্থা হয়। দক্ষিণারঞ্জনেরই আগ্রহে ও সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার অভিজাত-সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য "ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন্" ও দেশীয় কর্ম্মচারীদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার জমিদারীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ৪৮০ একর পরিমিত জমির উপস্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন গুণগ্রাহী ছিলেন। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ভাগ্যান্বেষণে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তত্রত্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার ও "সমাচার হিন্দুস্থানী"র সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। ক্যানিং কলেজের একটি প্রথম গ্রাজুয়েট ছাত্র বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিলে তিনি তিন বৎসর এই যুবককে বাৎসরিক ৬০ গিনি হিসাবে অর্থসাহায্য করেন। বলা বাহুল্য, এই বালকই লব্ধপ্রতিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ বি দে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো দক্ষিণারঞ্জনকে "রাজা" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও অন্যান্য সংস্কার-সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Indian Reform Society নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

অযোধ্যায় দক্ষিণারঞ্জনের এরূপ প্রভাব ছিল যে, অযোধ্যার চীফ কমিশনার স্যর জর্জ কুপারের ন্যায় লোককে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট হইতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারে স্যর জর্জ্জ কুপারের বিশেষ আধিপত্য ছিল, কিন্তু তথাচ দক্ষিণারঞ্জন আপত্তি করায় স্যর জর্জ্জকে এই পদ পাইতে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য লইয়া ইংলণ্ডে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন এই সমিতির সভ্যগণের নিকট সাক্ষ্যপ্রদান-মানসে ইংলণ্ড-গমনের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ দক্ষিণারঞ্জন ইংলণ্ডে গমন করিতে পারেন নাই।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভজাত তাঁহার একমাত্র পুত্র মনোহররঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌ নগরীতে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রথমা স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরীর গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের একটি মাত্র কন্যা মুক্তকেশীর জন্ম হয়। মুক্তকেশী বুদ্ধিমতী এবং চিত্রাঙ্কনে ও সূচীকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন। স্বনামধন্য হরিমোহন ঠাকুরের অন্যতম প্রপৌত্র রঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত মুক্তকেশীর বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে মুক্তকেশীর তিন কন্যা ও এক পুত্র রণেন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। রণেন্দ্রমোহন "বাঙ্গালার লিওহাণ্ট" প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্যতমা প্রদৌহিত্রী শ্রীমতী সুলাজিনী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলা দেবীর সহিত স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র আর্য্যকুমারের বিবাহ হইয়াছে।

মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের একমাত্র পুত্র মনোহর-রঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। মনোহরের সহিত কান্যকুব্জ-দেশীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কাশীরাম সুকুলের কন্যা শ্রীমতী রামকুমারী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। মনোহররঞ্জনের দুই কন্যা—প্যারীকুমারী ও মানসুন্দরী এবং এক পুত্র ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন কৃষ্ণনগর-নিবাসী এক

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত ভুবনরঞ্জনের বিবাহ দেন। ভুবন-রঞ্জনই দক্ষিণারঞ্জনের বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। কিছুকাল হইল, ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই। প্রকাশ, ইহার এক কন্যার সহিত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।



নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

৺নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাজা দক্ষিণারঞ্জনের ভ্রাতৃগণের মধ্যে ৺নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে মাতামহ সূর্য্যকুমার ঠাকুরের বাটীতে নিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পঞ্চভ্রাতা—রাজা দক্ষিণারঞ্জন, কালিকারঞ্জন, বিশ্বরঞ্জন, নিরঞ্জন, সর্ব্বরঞ্জন। নিরঞ্জনের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিজলী কাঁথির লবণ-কুঠীর সদর আমীন ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পারশ্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল বলিয়া তাঁহাকে "মৌলবী মুখুয্যে" বলিত। দক্ষিণারঞ্জনের পিতা পরমানন্দ ওরফে জগন্মোহন পিরালী-বংশে ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করায় ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কুলভঙ্গ হয়। জগন্মোহন ও নিরঞ্জনের মাতৃপিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর সম্বন্ধে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের জীবনীতেই বলা হইয়াছে।

বাল্যকালে নিরঞ্জন তাঁহার অগ্রজ দক্ষিণারঞ্জনের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষা করেন। হিন্দু কলেজে তাঁহার শেষ শিক্ষা লাভ হয়। নিরঞ্জন পরে কাশীধামে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। এই দুই ভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান উত্তরকালে দেশীয় করদ রাজ্যাদিতে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। শিক্ষা-সমাপনান্তে নিরঞ্জন কিছুদিন কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর দেওয়ানের কার্য্য করেন। অনতিকাল পরেই তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী পান এবং কিছুকাল কৃষ্ণনগর, যশোহর ও পূর্ণিয়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের

কার্য্য করেন। তিনি যশোহরের বিখ্যাত ইতিহাস-রচয়িতা স্যর জেম্‌স্ ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ডের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিরঞ্জন মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে রেওয়ার মহারাজার সেক্রেটারী ও নায়েব-পদে নিযুক্ত হন। নিরঞ্জন পাতিয়ালা এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত রেওয়াধিপতির সখ্য স্থাপন করিয়া দেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী ডিউক অব এডিনবরা তাঁহাকে লক্ষ্নৌ নগরীতে একখানি ফটোগ্রাফ্ উপহার দেন। দক্ষিণারঞ্জনের সহিত নিরঞ্জনও লণ্ডনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ উভয়েরই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

এই সময়ে নিরঞ্জন কাশীতে অবস্থান করিয়া ভিজিয়ানাগ্র্যমের মহারাজার সেক্রেটারীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁহাকে ত্রিবাঙ্কুরের হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত একটি কারুকার্য্যময় দ্রব্য উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় রাজদর্পণের প্রথম খণ্ড কাশী নরেশগণের ইতিহাস রচনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা তৎকালে সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসেন। নিরঞ্জন তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। যুবরাজের সহচর লর্ড চার্লস্ বেরেসফোর্ডের সহিত নিরঞ্জন পূর্ব্বে পরিচিত থাকায় তিনি যুবরাজ যে "সির‍্যাপিস" জাহাজে আসিয়াছিলেন সেই জাহাজ নিরঞ্জনকে দেখাইবার জন্য জাহাজের কাপ্তেনকে অনুরোধ-পত্র দেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রেওয়াধি-পতির কোনও কর্ম্মোপলক্ষে এবং দেশভ্রমণের জন্য নিরঞ্জন কাশ্মীর

রাজ্যে গমন করেন। এই বৎসর তাঁহার একটি সন্তান কালকবলে পতিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নিরঞ্জন জয়পুরে বেড়াইতে যান। জয়পুরে অবস্থানকালে নিরঞ্জনের সহিত প্রাচ্য-সাহিত্যবিশারদ এড্‌ওয়ার্ড বাক্‌হাউস ইষ্টউইক মহোদয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। ইষ্টউইক প্রথমে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে ও পরে পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি তদানীন্তন ভারত-সচিব মার্কুইস অব সলিসবেরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে নিরঞ্জন তাঁহাকে "ভারতবর্ষীয় রাজদর্পণ" প্রথম খণ্ড উপহার দেন। নিরঞ্জন যোধপুরের রাজবংশের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতেছিলেন; সেই ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি তিনি সানন্দে ইষ্টউইককে প্রদান করেন এবং পান্না, রাটলাম, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধেও নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেন।

ভারতবর্ষের বহু দেশীয় রাজার রাজ্যে নিরঞ্জন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনেক দেশীয় রাজার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আলোয়ারের মহারাজ শিউদমন সিংহ তাঁহাকে কোনও কার্য্যের জন্য বার্ষিক তিন হাজার টাকা পেনসন দিয়াছিলেন। কপূর্রতলার মহারাজা জগৎজিৎ সিংহ নিরঞ্জনকে একটি সোণার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন উপহার দিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ও পিতামহও নিরঞ্জনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

কেবল ভারতবর্ষ নহে—ব্রহ্মদেশের রাজা থিবোর রাজত্বকালে নিরঞ্জন ব্রহ্মদেশেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রাজা থিবো ও তাঁহার রাণী (বৈমাত্রেয় ভগিনী) সুপিয়ালাত কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। থিবো তাঁহাকে একটি সোণার বাটী উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্যর আলফ্রেড লায়ালের সহিত ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে নিরঞ্জনের অনেক কথাবার্ত্তা

হয়। তাঁহার নিকট ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দূত (Ambassador) হইবার জন্য নিরঞ্জন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কারণ ইহার কিছুদিন পরেই ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সর্ব্ব-রঞ্জনের ৺কাশীপ্রাপ্তি হয়। সর্ব্বরঞ্জন পুলিশ-বিভাগে কার্য্য করিতেন এবং নিরঞ্জনের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ভ্রাতৃ-বিয়োগের কিছুদিন পরেই কাশীধামস্থ বাটীতে চুরি হওয়ায় নিরঞ্জনের প্রায় তিন সহস্র টাকার ক্ষতি হয়। ইহার অল্পকাল পরেই অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই আগষ্ট নিরঞ্জন তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী মেঘাম্বরী দেবীকে হারান। ইনি মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী এবং সদর দেওয়ানি আদালতের ও হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার বন্ধু নিরঞ্জনকে সান্ত্বনা দেন। নিরঞ্জন অধিকাংশ সময় বারাণসীতেই থাকিতেন এবং সেখান হইতে রাজেন্দ্রলালের জন্য কিংবা তাঁহার অনুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটীর জন্য দুষ্প্রাপ্য পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন এবং নানা দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে কথা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার নিকট অবগত হইতেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হইলে নিরঞ্জন হৃদয়ে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন।

নিরঞ্জন Mesmerism এর চর্চ্চা করিতেন। রাজেন্দ্রলালকে একবার mesmeric চিকিৎসা করিয়া তিনি ফল দেখাইয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরকেও একবার ঐরূপ চিকিৎসা করায় তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

লর্ড লরেন্স হইতে প্রত্যেক বড়লাট ও স্যর উইলিয়ম গ্রে হইতে প্রত্যেক ছোটলাটের সহিত নিরঞ্জন ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। নিরঞ্জন অনেক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের তরবারি অন্যতম। এই তরবারিটী মোগল সম্রাট্‌গণ সযত্নে রক্ষা করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শেষ মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হন। প্রাসাদ-লুণ্ঠনের সময় সেই তরবারি জনৈক ভারতীয় সৈনিকের হাতে আসে। তরবারির ফলকটি সেই সৈনিকের মৃত্যুর পর নিরঞ্জন সংগ্রহ করেন। লর্ড কারমাইকেলের দ্বারা নিরঞ্জন সেই তরবারির ফলক সম্রাট্‌কে উপহার দেন। সম্রাট্ সেই তরবারি পাইয়া নিরঞ্জনকে তাঁহার স্বাক্ষরিত একখানি ফটো প্রেরণ করেন। সম্রাটের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী লর্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডহাম এই সম্পর্কে লর্ড কারমাইকেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

Windsor Castle
5th May 1916.

Dear Lord Carmichael,

The sword presented to the King Emperor by Babu Niranjan Mookherjee arrived safely and has been submitted to His Majesty. Will you please convey to him the thanks of His Majesty for the interesting weapon, its historical blade having belonged to the illustrious Baber, the founder of Mogul dynasty.

Believe me
Yours very sincerely,
Stamfordham

লর্ড কারমাইকেলও নিরঞ্জনকে একটি আবক্ষ-প্রতিমূর্ত্তি ও একখানি ফটো প্রদান করেন।

নিরঞ্জন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনেই প্রতীতি হয় যে, তিনি শরীরের প্রতি কিরূপ যত্ন লইতেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যরঞ্জনের ও কনিষ্ঠা কন্যা সুকেশীদেবীর মৃত্যু হয়। তিনি সদালাপী ও অমায়িক ছিলেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরঞ্জন অতি উদার ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু কখনও অতিরক্ষণশীল ছিলেন না। এইজন্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যরঞ্জনের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতমা দৌহিত্রী (জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর কন্যা) ইরাবতী দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুকেশী দেবীরও ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম পুত্র কৃতীন্দ্রের সহিত বিবাহ দেন। কোনও বিবাহেই নগদ টাকা ও অলঙ্কার প্রভৃতির দাবি ছিল না।

নিরঞ্জনের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি সেকালের কথা বলিতে বলিতে যেন যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া পাইতেন।

নিরঞ্জনের জ্যেষ্ঠপুত্র পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন বলিয়াছি। এক্ষণে নিরঞ্জনের কনিষ্ঠ পুত্র নৃসিংহরঞ্জন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের একমাত্র পুত্র নিখিলরঞ্জন বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারা উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। নৃসিংহবাবু স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র পরলোকগত ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। নিখিলবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র পরলোকগত শৈলেন্দ্রভূষণ ~~ঠাকুরের~~ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই পত্নীবিয়োগের পর হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার উমাপদ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। নিখিল বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত চিত্রকলাচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হয়। তাঁহার দ্বিতীয়া ভগিনীর সহিত



পুত্রপৌত্রাদি বিবেষ্টিত নিরঞ্জন মুখোপ

মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র শ্রীযুত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলীর বিবাহ হয়। নৃসিংহবাবু বেনারস কুইনস কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া ইংরাজীতে পারদর্শিতার জন্য স্বর্ণ পদক পারিতোষিক পান। তিনি আজমীর রায়পুরের রাজকুমার কলেজের এসিষ্ট্যাণ্ট প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া হাওড়ায় ও কুমিল্লায় স্বীয় কার্য্যে যশোলাভ করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

নিখিলবাবুও বেনারস কুইনস কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেকটর ছিলেন। এখন তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে আয়করের সহকারী কমিশনার।

করটিয়া জমিদার-বংশ

করটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশ পাঠান সম্প্রদায়ের পন্নীবংশ-সম্ভূত। সৈয়দ মুহম্মদ গিসুদারাজ বান্দানেওয়াজ নামক জনৈক ধার্ম্মিক মহাপুরুষ আরব হইতে আফ্‌গানিস্তানে আগমন করিলে তত্রত্য প্রসিদ্ধ পাঠান সম্প্রদায়ের তিনটী বিশিষ্ট বংশ হইতে তাঁহাকে তিনটি কন্যা-সম্প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে কররাণীবংশীয় কন্যার গর্ভে উর্দ্দুক এবং পন্নী নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পন্নীর বংশাবলী ক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইঁহারা আপনাদিগকে কখনও পন্নী, কখনও কররাণী এবং কখনও বা খান্ চৌধুরী নামে অভিহিত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে গুলবরগা শরীফে সৈয়দ মুহম্মদ গিসুদারাজ বান্দানেওয়াজের মাজার অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি সুলতান সুলেমান কররাণী এই বংশ-সম্ভূত। সুলেমান কররাণীর দুই পুত্র—বায়েজিদ্ খান্ পন্নী ও দায়ুদ খান্। বায়েজিদ্ আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন এবং মোগল-পাঠান যুদ্ধের ফলে দাউদ্ খাঁর মৃত্যু হয়। বায়েজিদ্ খাঁর পুত্র—সইদ খান্ পন্নী সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক সরকারে বাজুহার শাসনকর্ত্তৃত্ব ও পরগণে আলাপশাহী জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন। ইঁহার চেষ্টায় মোগল-পাঠানের মিলন হয়। পাঠান-যুদ্ধের অবসানে ইনি আটিয়া গ্রামে আপনার আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করেন। সইদ্ খাঁই আটিয়া পরগণায় লোকপ্রতিষ্ঠার মূল। ইঁহার প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি পাইয়াই সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান আটিয়া পরগণায় বসতি স্থাপন করেন। সইদ্ খাঁ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আটিয়ার সমস্ত প্রজাকে কর্ষিত ভূমির

এক পঞ্চমাংশ নিষ্কর প্রদান করেন। এই নিষ্করের নাম "শরহ্ কমী"। এখনও আটিয়া পরগণার অধিবাসিগণ সইদ্ খাঁর প্রদত্ত এই "শরহ্ কমী" ভোগ করিতেছেন। ইনি বাবা আদম কাশ্মীরী বা শাহান্ শাহ্ সাহেবের মাজার শরিফের ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্য একটি মহাল দান করিয়াছিলেন। উহা তৎকালে "আতীয়া" অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত মহাল নামে পরিচিত ছিল। মুর্শীদকুলি খাঁর সময়ে এই "আতীয়া" আটিয়া নাম ধারণ করিয়াছে। শাহান্ শাহ্ সাহেবের মাজার শরিফ অদ্যাপি এই স্থানে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এইস্থানে সইদ্ খাঁ-প্রতিষ্ঠিত একটি মস্‌জিদও বর্ত্তমান আছে। শুনা যায়, এই মাজার শরিফে কেহ কোনও "মানস" করিলে তাহা অপূর্ণ থাকে না। অদ্যাবধি হিন্দু মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই পবিত্র সমাধি-স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। বহু দূর দেশ হইতে পরিব্রাজকগণ এই পুণ্য-পীঠ দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন। করটিয়ার অন্যতম জমিদার ধর্ম্মপ্রাণ মৌলবী মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই মাজার শরিফের কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে। জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় স্থানসমূহ তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছে। মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেব বঙ্গের স্বাধীন পাঠান নরপতি সুলেমান কররাণীর অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। ইঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ—মইন খান্ পন্নীকে (চৌধুরী) বাদশাহ আওরঙ্গজেব আটিয়া ও আলাপশাহী পরগণার চৌধুরাই ফর্ম্মান প্রদান করেন। ইনি একজন সিদ্ধ তাপস ছিলেন, ইঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইনি স্বীয় নামানুকরণে মইননগর গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় আপনার বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। মোঃ হাএদর আলী সাহেবের পিতামহ দেওয়ান সাদৎ আলী খান্ চৌধুরী সাহেব মইনগর বা গোড়াই

পরিত্যাগ করিয়া করটিয়া গ্রামে আবাস স্থাপন করেন। তদবধি করটিয়া গ্রামেই ইহারা বসবাস করিতেছেন। সাদৎ আলী সাহেবও একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সাধনা সম্বন্ধেও নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। করটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জামে মসজিদের নির্ম্মাণকার্য্য হজরত সাদৎ আলী খান্ পন্নী সাহেব কর্ত্তৃক ১২৮৭ সালে আরম্ভ হইয়া ১২৯৮ সালে তৎপুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান্ পন্নী সাহেব কর্ত্তৃক সমাধা হয়। সাদৎ আলী খান্ পন্নী সাহেবের সময়েই করটিয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল ও মাদ্রাসা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেবের পিতা হাফেজ মাহমুদ আলী খান্ পন্নী সাহেব একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গোড়াই বা মইননগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১০।১২ বৎসর বয়সে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইলেও তাঁহার অনুভূতি ও অনুধাবন-শক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া সেগুলি "সাচ্চা" কি "ঝুঁটা" তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। মূল্যবান্ কাশ্মীরী বস্ত্রাদি শুধু হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়াই তাহাদের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন। সেতার বাদ্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল, তিনি নিজে একজন উত্তম সেতার-বাদক ছিলেন। সমগ্র কোরাণ শরীফ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, এজন্য তাঁহাকে "হাফেজ" আখ্যায় অভিহিত করা হইত। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোঃ মোঃ ওয়াজেদ্ আলী খান্ পন্নী সাহেব ও শ্রীযুক্ত মোঃ মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেব—এই দুই পুত্র এবং

শ্রীযুক্তা বেগম রওশান আক্তার—এই একটি মাত্র কন্যা বর্ত্তমান আছেন।

মৌলবী মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেব

করটিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ জমিদার মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেব বুদ্ধিমান, ধর্ম্মশীল, প্রজারঞ্জক ও ন্যায়পরায়ণ জমিদার। তাঁহার জমিদারী বাঙ্গলাদেশের পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত, উহার আয় প্রায় পৌণে দুই লক্ষ টাকা।

তিনি হিন্দু ও মুসলমান—উভয়েই সমদর্শী। তিনি স্বয়ং নিষ্ঠাবান্ মুসলমান, এজন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নহেন। বিগত হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামার সময় তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি-প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মোঃ হাএদর আলী সাহেব অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্লিপ্ত ও নিরহঙ্কার। ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও বিলাসিতার চিহ্নমাত্র তাঁহাতে নাই। তিনি শান্ত, শিষ্টাচারী, বিনয়ী ও দীনবৎসল।

তিনি চট্টগ্রামের সিদ্ধ মহাপুরুষ পরলোকগত হজরত মৌলানা আবদুল হাই সাহেবের শিষ্য। তাঁহারই উপদেশ এবং প্রেরণায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইয়াছে। হাএদর আলী সাহেব সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গপ্রিয়, সাধুসঙ্গ-লাভাশায় বহুবার তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া হিংস্রজন্তুসমাকুল দুর্গম অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে বাস করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা এবং ভগবৎ-প্রসঙ্গে কালাতিপাত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব তাঁহার

গোপন দানে। "তাঁহার দক্ষিণহস্ত যাহা দান করে, বামহস্ত তাহা জানিতে পারে না।" তাঁহার এইরূপ দানের পরিমাণ কত, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা বহু চেষ্টায় বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। তিনি নীরবকর্ম্মী, মান ও যশের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কাজেই তাঁহার দানাদিকার্য্য ঢক্কানিনাদের সহিত বাহিরে প্রচারিত হয় না।

অতিথিসৎকার কার্য্যাদিতে তাঁহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এইসকল কার্য্য তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, কদাচ ভৃত্য বা কর্ম্মচারিগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না।

শ্রীযুত হাএদর আলী সাহেব বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যে এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তু জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছে। সম্প্রতি ইনি একটিমাত্র গুলিতে ১০ ফিট্ ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger) শিকার করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত মোঃ মেহ্দি আলী সাহেব এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মোঃ সইদ খান পন্নী সাহেব শিকারের সময় সর্ব্বদা পিতার সঙ্গে থাকিয়া শিকারকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন।

মোঃ হাএদর আলী সাহেবের বয়স বর্ত্তমানে প্রায় ৫০ বৎসর। তিনি দীর্ঘকাল অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। গত ১৯১১ খৃঃ অব্দে দিল্লীর রাজদরবারের সময় তাঁহাকে দিল্লী দরবার মেড্যাল প্রদান করা হয়। তাঁহার দুই পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম—মোঃ মেহ্দি আলী খান্ পন্নী, এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম—মোঃ সইদ্ খান্ পন্নী। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত মেহ্দি আলী সাহেবই তাঁহার

এষ্টেটের কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার ধনশালী হিন্দু মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে তাঁহাকে একজন আদর্শ শ্রেণীর জমিদার বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই প্রার্থনা।

জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা

মোঃ মেহ্দি আলী খান্ পন্নী

ইনি পিতার ন্যায়ই অমায়িক, প্রজাবৎসল এবং উদারহৃদয়। মেহ্দি আলী সাহেবের বয়স ২২।২৩ বৎসর। ইনি সুশিক্ষিত, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ভ্রাতৃবৎসল এবং পিতৃভক্ত। তিনি প্রথমে তাঁহার উপযুক্ত গৃহশিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মিত্র ধর্ম্মসারঙ্গ মহাশয়ের* তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে নাগপুর "রাজকুমার কলেজে" শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত মেহ্দি আলী সাহেব দেলদোয়ারের জমিদার লেফ্টেন্যাণ্ট সৈয়দ মহম্মদ হোসেন চৌধুরী সাহেবের প্রথমা

---

* শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। বাঙ্গলার অগ্নি-যুগে তিনি একজন একনিষ্ঠ ও ত্যাগী কর্ম্মী ছিলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব-প্রতিষ্ঠিত (অধুনা-লুপ্ত) সুবিখ্যাত "সন্ধ্যা" পত্রিকার তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন চিন্তাশীল সুলেখক, "বোধন" ও "মহাত্মার অহিংস ধর্ম্ম" প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস মহাত্মাজি-লিখিত "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন" নামক একখানি গুজরাতী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (বঙ্গানুবাদ) সংশোধনের ভার শ্রীযুক্ত সুরেশবাবুর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার গৃহদাহে সেই অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-খানি ভস্মীভূত হইয়াছে। সুরেশবাবু টাঙ্গাইল মহকুমার দশকিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীযুত হাএদর আলী সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী।

কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুত্রের নাম—শ্রীমান্ বায়েজিদ্ খান পন্নী ওরফে সেলিম খান্ পন্নী ও কন্যার নাম শ্রীমতী মরিয়ম খাতুন। ইঁহারা উভয়েই শিশু।

বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, মেহদি আলী সাহেব এই অল্প বয়সেই তাঁহার প্রজাগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রজাগণের একখানি অভি-নন্দন-পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"মহাত্মন্, আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশের ভূম্যধিকারিগণের অধিকাংশই প্রজাগণের দুঃখ ও দুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন, অধিকাংশ ভূম্যধিকারী বিদেশে বিলাস-ব্যসনে পরিবৃত থাকিয়া প্রত্যহ অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এদিকে তাঁহাদের দুঃস্থ প্রজাবর্গ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া দলে দলে আসামের গভীর অরণ্যে জীবিকান্বেষণের জন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

মহাত্মন্, আপনি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকায় দুঃস্থ প্রজাগণের এই সকল দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন আমরা আপনার করুণ হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাই আজ আমরা আপনার প্রজাবৃন্দ একান্ত ভক্তির সহিত আপনার করকমলে এই ক্ষুদ্র অভিনন্দনপত্রখানি প্রদান করিলাম। আপনি যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন আশা করি, প্রকৃতিপুঞ্জের রাজভক্তির কথা আপনার পিতৃদেব—পাঠান-গৌরব-রবি দীন-প্রতিপালক ভক্তিভাজন শ্রীযুত মৌঃ মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নী সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিয়া প্রজাবর্গের উপর তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা-দৃষ্টে আমাদের মনে হয়, পল্লীহিতকর কার্য্যের জন্য লোকাল বোর্ড এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সহায়তা নিতান্তই আবশ্যক। যদি কোনও ত্যাগী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তির হস্তে এই উভয় অনুষ্ঠানের ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা একেবারে হতাশ হইয়াছি। তাই আমরা বিনীতভাবে আপনার ন্যায় ত্যাগী ও মহাপ্রাণ যুবককে উল্লিখিত দুইটি অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, আমাদের এই আবেদন উপেক্ষিত হইবে না।"

এই অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

"ভ্রাতৃগণ, আমার প্রতি আপনাদের অনাবিল স্নেহ ও ভালবাসার কথা আমার ভক্তিভাজন পিতাসাহেবকে আমি অবশ্য জ্ঞাপন করিব। আপনাদের সরলতাপূর্ণ করুণ বাক্যগুলি আমার হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে। আমি জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে প্রাণপণে আজীবন চেষ্টা করিব,—ইহাই আমার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হইবে। আমি আপনাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশার বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়ার জন্য আপনাদের পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিব, আমাকে সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাদের সহিত মিশাইয়া দিব। আমি জমিদাররূপে নহে—প্রভুরূপে নহে, দীন সেবকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আমার উল্লিখিত সকল কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব। আমি কখনও ভুলিব না যে,—

"Princes or Lords may flourish or may fade,
A breath can make them as a breath has made.
But a bold peasantry—their country's pride,
When once destroyed, can never be supplied."

আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে দেশের প্রতাপশালী জমিদার-শ্রেণী এই পথে অগ্রসর হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

কনিষ্ঠ সাহেবজাদা

মোঃ সইদ্ খান্ পন্নী

শ্রীযুত মেহ্‌দি আলী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ মোঃ সইদ্ খান্ পন্নী সাহেবের এখনও পাঠ্যাবস্থা। তাঁহাকে সম্পূর্ণ ইস্‌লামের আদর্শে গঠিত করাই তাঁহার পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা। সইদ্ খান্ পন্নীসাহেব সুশীল এবং বুদ্ধিমান। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই নিরহঙ্কার, বিনয়ী এবং উদারহৃদয়।

শ্রীযুত মোঃ জাফর আলী খান্ পন্নী

ইনি শ্রীযুত মোঃ হাএদর আলী খান্ পন্নীসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং করটিয়ার অন্যতম জমিদার। ইনি আলিগড় কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুত সৈয়দ মাহ্‌মুদ মুজাফর অল্ মুছাবী

ইনি শ্রীযুত মোঃ হাএদর আলী সাহেবের ভাগিনেয় এবং করটিয়ার অন্যতম জমিদার। ইনিও আলিগড়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বংশ-পত্রিকা

—:০:—

সোলেমান কররাণী—(গৌড়ের স্থলতান।)

বায়েজিদ খান্ পন্নী

সইদ্ খান্ পন্নী

ফতেখান্ পন্নী

সলিম খান্ পন্নী

মইন খান্ পন্নী

মুনায়েম খান্ (চৌধুরী)

দেওয়ান খোদা নেওয়াজ খান্ চৌধুরী

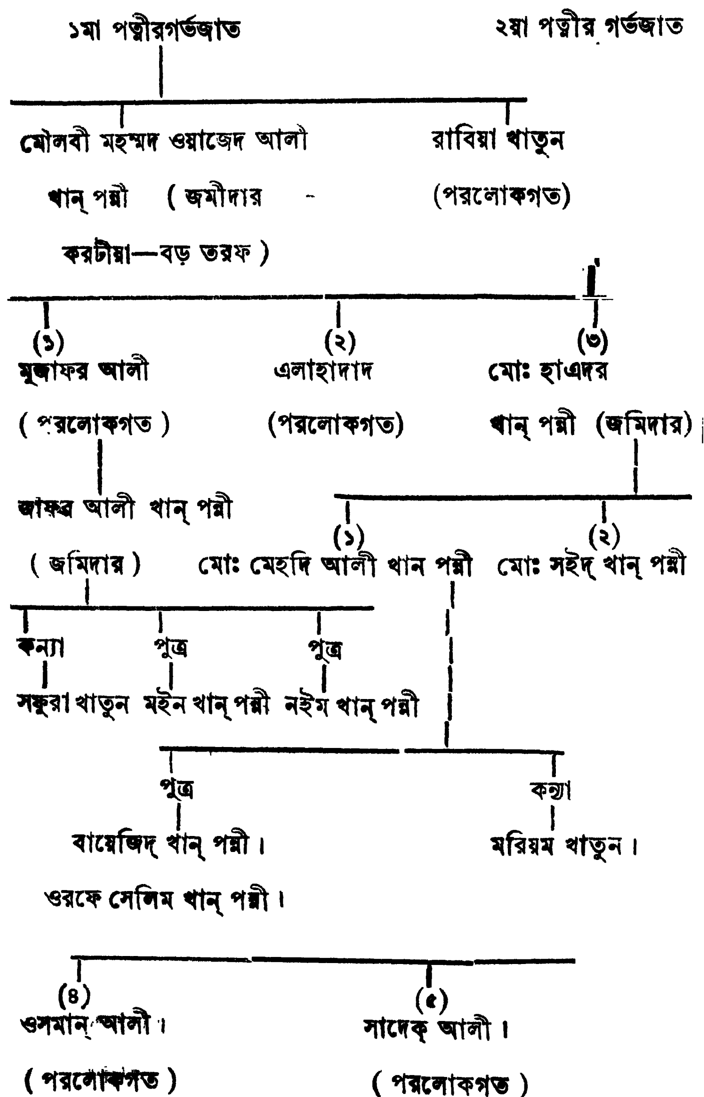
দেওয়ান আলেপ্ খান্ চৌধুরী

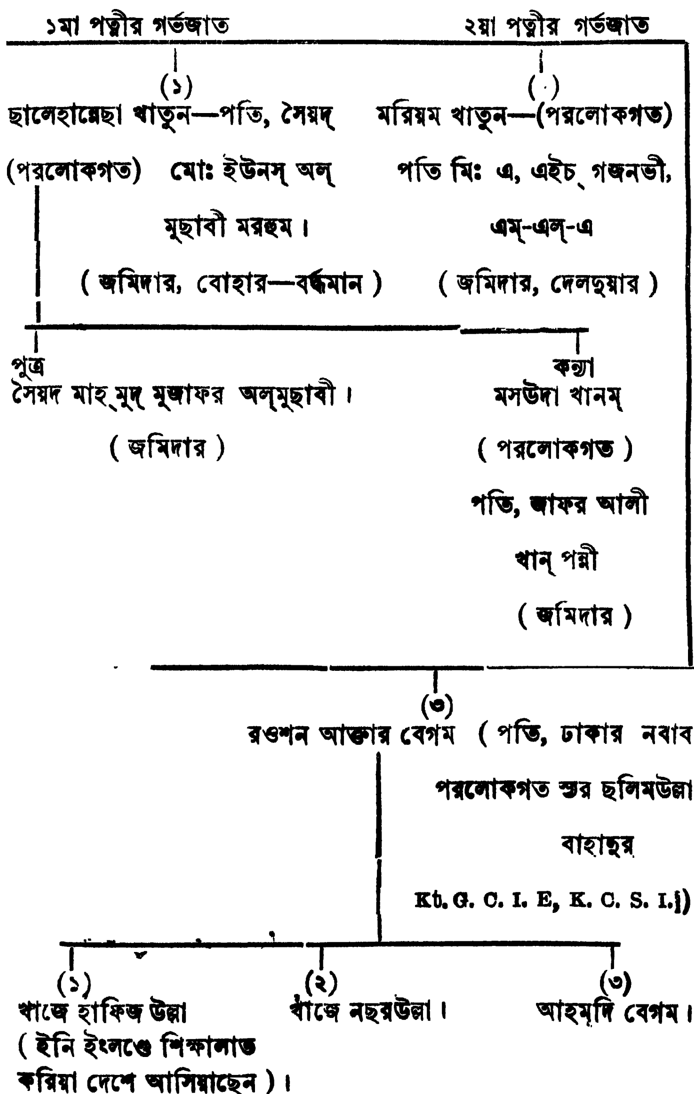
দেওয়ান ফয়েজ আলী খান্ চৌধুরী

দেওয়ান সাদৎ আলী খান্ চৌধুরী—ওরফে হাএদর জান্।

হাফেজ মাহ্মুদ আলী খান্ পন্নী

প্রথমা পত্নী হজরতা খোদেজা খানম সাহেবার গর্ভজাত	দ্বিতীয়া পত্নী হজরতা আয়েশা খানম সাহেবার গর্ভজাত


১মা পত্নীরগর্ভজাত
২য়া পত্নীর গর্ভজাত
মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ আলী
খান্ পন্নী (জমীদার -
করটীয়া—বড় তরফ)
রাবিয়া খাতুন
(পরলোকগত)
(১)
মুজাফর আলী
(পরলোকগত)
(২)
এলাহাদাদ
(পরলোকগত)
(৩)
মোঃ হাএদর
খান্ পন্নী (জমিদার)
জাফর আলী খান্ পন্নী
(জমিদার)
(১)
মোঃ মেহদি আলী খান পন্নী
(২)
মোঃ সইদ্ খান্ পন্নী
কন্যা
পুত্র
পুত্র
সফুরা খাতুন
মইন খান্ পন্নী
নইম খান্ পন্নী
পুত্র
বায়েজিদ্ খান্ পন্নী।
ওরফে সেলিম খান্ পন্নী।
কন্যা
মরিয়ম খাতুন।
(৪)
ওসমান্ আলী।
(পরলোকগত)
(৫)
সাদেক্ আলী।
(পরলোকগত)


১মা পত্নীর গর্ভজাত
২য়া পত্নীর গর্ভজাত
(১)
ছালেহান্নেছা খাতুন—পতি, সৈয়দ্
(পরলোকগত) মোঃ ইউনস্ অল্
মুছাবী মরহুম।
(জমিদার, বোহার—বর্দ্ধমান)
( )
মরিয়ম খাতুন—(পরলোকগত)
পতি মিঃ এ, এইচ্ গজনভী,
এম্-এল্-এ
(জমিদার, দেলদুয়ার)
পুত্র
সৈয়দ মাহ্মুদ্ মুজাফর অল্মুছাবী।
(জমিদার)
কন্যা
মসউদা খানম্
(পরলোকগত)
পতি, জাফর আলী
খান্ পন্নী
(জমিদার)
(৩)
রওশন আক্তার বেগম (পতি, ঢাকার নবাব
পরলোকগত স্তর ছলিমউল্লা
বাহাদুর
Kt. G. C. I. E, K. C. S. I.)
(১)
খাজে হাফিজ উল্লা
(ইনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ
করিয়া দেশে আসিয়াছেন)।
(২)
খাজে নছরউল্লা।
(৩)
আহম্মদি বেগম।

বারাওন রাজবংশের ইতিহাস

বারাওন রাজবংশ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। বিখ্যাত কাহান কুব্জ বংশ হইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি। এই বংশের আদিপুরুষ মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য ভরদ্বাজ ঋষি। ইহারা যজুর্ব্বেদাবলম্বী। ইহাদের বংশগত উপাধি হীরাপুরি পাঁড়ে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ফরাক্কাবাদ জেলায় হীরাপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়াই ইহাদের এই উপাধি হইয়াছে।

রাজা রঘুপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুর বর্ত্তমান রাজবংশের কর্ত্তা। তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গদীতে আরোহণ করেন। এই প্রদেশের মধ্যে তিনি একজন অতি শক্তিশালী, উৎসাহশীল ও সুদক্ষ জমিদার। অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি সবিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন এবং সাধারণ ও প্রজাবর্গের হিত-সাধনের জন্য বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। রাজ্যের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই উদ্যোগী। রাজ্যে জল-সেচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত তিনি ৭৫টী পাকা কূপ ও ১৬টী পুকুর ও দুইটী বাঁধ খনন করিয়াছেন। এক সময়ে জেলা বোর্ডে টাকার অভাব হওয়ায় কলভিন্ হাসপাতালটী ২য় শ্রেণীর হাসপাতালে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রায় বাহাদুর রঘুপ্রসাদ তখন নিজে হাসপাতালের জন্য ৫ হাজার টাকা দেন এবং অন্য লোকদের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া হাসপাতালটীকে রক্ষা করেন। প্লেগের সময় তিনি টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়া প্রজাবর্গকে সাহায্য

করেন। দেশী চিনির প্রচলনের জন্য তিনি বারাওনে একটি বাষ্পীয় চিনির কারখানা স্থাপন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কারখানাটি এখন ইক্ষুদণ্ডের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে। ১৯০৮—৯ সালে তিনি এলাহাবাদ জেলা-প্রদর্শনীর কৃতকার্য্যতার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রদর্শনীর অনারারি জেনারল সেক্রেটারী ছিলেন। গত যুদ্ধে তিনি গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্বর্ণমণ্ডিত খিলাত, একখানা তরবারি ও বড়লাটের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি সনদ প্রদান করেন। তিনি যুদ্ধ-ভাণ্ডারসমূহে ২৫ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করেন। যুক্ত প্রদেশের মহিলা সমিতিতে তিনি প্রতি মাসে দুই শত টাকা প্রদান করেন। সেই সমিতি গত যুদ্ধের সময় তিন বৎসর যাবৎ স্থায়ী ছিল। তিনি আর একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, সেই কার্য্যটী হইল—১৯১৪ সালে আগ্রা প্রাদেশিক জমিদারসভার প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি অনারারি জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। গত ৩০।৪০ বৎসর যাবৎ যুক্ত প্রদেশে কোন জমিদার-সভা ছিল না, বারাওনের রাজাই অক্লান্ত পরিশ্রমে যুক্ত প্রদেশের এই অভাব দূর করেন। তাঁহার প্রজাবর্গ Baraon Demonstration Farmএর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাবর্গের কল্যাণার্থ যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য সরকার বাহাদুর তাঁহাকে "রাজা" ও "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন। তাঁহাকে অস্ত্র আইনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি একজন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বহু মানপত্র (Certificate of Honour) ও খিলাত পাইয়াছেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহের ন্যায় রাজা রঘুপ্রসাদ নারায়ণও ১৯১১ সালে দিল্লী করোনেশন দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পুষা কৃষি বিদ্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যর জন হিউয়েট্ ও স্যর জেম্‌স্ মেষ্টন তাঁহার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্যর জেম্‌স্ মেষ্টন বারাওন রাজপ্রাসাদে বেড়াইতে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বারাওনের রাজার এক কন্যা ও তিন পুত্র। পুত্রেরা এলাহাবাদে শিক্ষালাভ করিতেছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কানোয়ার ভেঙ্কটেশনারায়ণ সিং।

ববিলি সমস্থানমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ববিলি সমস্থানম ভারতের মধ্যে একটি প্রাচীন জমিদারী। এই জমিদারী মাদ্রাজ প্রদেশের ভিজাগাপটমে অবস্থিত। এই জমিদার বংশ রাজপুত জাতির সমকক্ষ, ইঁহারা রাজপুতদিগের ন্যায় সুগঠিত দেহবিশিষ্ট ও যুদ্ধক্ষম। ইঁহারা স্বভাবতঃই গর্ব্বিত এবং নিজের জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও দাসত্ব করে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষাবিষয়ে পশ্চাৎপদ।

এই জমিদারীর প্রধান সহর ববিলি। মহারাজা এইখানেই বাস করেন। ববিলি ভিজাগাপটম হইতে ৭২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ববিলিতে বিষ্ণু ও শিবের মন্দির আছে। তাহা ছাড়া ডেপুটী তহশীলদারের অফিস, থানা, সব রেজিষ্টারী অফিস প্রভৃতি আছে। এই সমস্থানমের প্রতিষ্ঠাতা রাজা পেড্ডা রায়ুডু বাহাদুর গারু। তিনি সের মহম্মদ খাঁর সহিত উত্তর ভারতে আগমন করেন। সের মহম্মদ তাঁহার রণনৈপুণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজম সমস্থানম জায়গীর দেন এবং তাঁহাকে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা বাহাদুর উপাধি ও সাদা নিশান, ডঙ্কা, নহবত ও রাজ-নিদর্শনের অন্য সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিবার অনুমতি দেন। দ্বিতীয় রাজা লিঙ্গপ্পা রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু। তিনি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে "রঙ্গ রাও" উপাধি পাইয়াছিলেন। এই উপাধি ববিলি রাজা ও রাজবংশের পুরুষদের নামের পরে ব্যবহৃত হয়। রাজা লিঙ্গপ্পা রঙ্গ রাওয়ের পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি ভেঙ্গল রাওকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ভেঙ্গল রাও ভেঙ্কটগিরি বংশের মাধব রাওয়ের তৃতীয়

পুত্র। রাজা ভেঙ্কল রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু যখন শিশু তখন লিঙ্গপ্পা রঙ্গ রাওয়ের মৃত্যু হয়। তিনি নাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং অতি যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য চালান। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি ও ধন দান এবং সাধারণের উপকারার্থ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। চতুর্থ রাজা রঙ্গপতি রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু। তিনি দাতা ও এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পঞ্চম রাজা রায়াদপ্পা রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ রাজা গোপাল কৃষ্ণ রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু। ইঁহাকে রাজা রায়াদপ্পা রঙ্গ রাও বাহাদুর পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে ফরাসীদিগের সাহায্য লইয়া ভিজিয়ানাগ্রামের রাজা পেড্ডা ভিজিয়ারামরাজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বব্বিলি দুর্গ আক্রমণ করেন। সপ্তম রাজা ভেঙ্কট রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু ১৭৯৪ হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অষ্টম রাজা রায়াদপ্পা রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু। তিনি ১৮০২ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকার হইতে মুলুক-ই ইন্তিমিরার উপাধি প্রাপ্ত হন। নবম রাজা শিত চালাপটি রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু। ১৮৩০ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব অতি দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার পিতা শ্রীবেণুগোপাল স্বামীর নামে যে মন্দির প্রস্তুত করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন তিনি সেই মন্দিরনির্ম্মাণ শেষ করেন এবং মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করেন। তাহা ছাড়া সীতারামপুরাম্ মন্দিরেও তিনি ঐ পরিমিত অর্থ দান করেন।

দশম রাজা সীতারাম কৃষ্ণ রায়াদপ্পা রঙ্গ রাও বাহাদুর গারু।

১৮৬৩ হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বব্বিলিতে একটি এংগ্লো-ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তিনি মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ রাণী জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করেন। রাণী পুরাতন প্রাসাদ অশুভ দেখিয়া নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইয়াছিল তখন তিনি ৫০ হাজার টাকা মূল্যের চাউল বাঙ্গালাদেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

রাণী তাঁহার স্বামীর জীবদ্দশায় প্রাপ্ত অনুমত্যনুসারে রাজা সর্ব্বগ্র কুমার যাচেন্দ্র বাহাদুরের তৃতীয় পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন।

একাদশ মহারাজা স্যর ভেঙ্কট সিত চালাপটি রঙ্গ রাও বাহাদুর জি-সি-আই-ই, সি-বি-ই ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভেঙ্কটগিরিতে রাণী তাঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বব্বিলিতে আগমন করেন এবং ডাক্তার মার্সের অধীনে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে তিনি জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। যে রাণী তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি সেই রাণীকে ৬০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের একটি সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি বব্বিলী মধ্য ইংরাজী স্কুলটীকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। এই স্কুলের জন্য তিনি একটি সুন্দর নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতির জন্য তিনি "বৃদ্ধ আনন্দিনী" সভা নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জুবিলীর স্মরণার্থ তিনি বব্বিলিতে "ভিক্টোরিয়া জুবিলী মার্কেট" নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট তাঁহাকে

উত্তরাধিকারসূত্রে "রাজা" উপাধি ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজমহল নামক অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ইউরোপ ভ্রমণ করেন। সেণ্ট জেম্‌স্‌ প্রাসাদে যে লেভী হয় মহারাজা সেই লেভীতে দূতগণের ফটক দিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভারত-সচিব তাঁহাকে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। বাকিংহাম প্রাসাদে যে ষ্টেট বলনাচ ও ষ্টেট্ কন্‌সার্ট দেওয়া হইয়াছিল তিনি তাহাতে নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৭ই জুলাই তারিখে উইণ্ডসর ক্যাসেলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। মহারাণী তাঁহাকে স্বনাম-স্বাক্ষরিত একখানি ফটো উপহার দেন। মহারাজা মহারাণীকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ একখানি রূপার পাত্র উপহার দিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত লর্ড কিম্বারলি, কোনেমারা, হার্সেল, নর্থব্রুক, রিয়ে, স্যর এম্ গ্রাণ্ট ডাফ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিগণের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ব্রাইটন, অকসফোর্ড, লিভারপুল, এডিনবার্গ ও বেডফোর্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিবার পথে তিনি পারিশ, লুশর্ণ, ভিনিস, ফ্লোরেন্স ও রোম পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজের নিমন্ত্রণে মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড ওয়েনলক বব্বিলিতে আসিয়া ভিক্টোরিয়া টাউনহলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই হল তিনি সাম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বব্বিলিতে গোসা হাসপাতাল ও লেডী এপথিকারিস হল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পরিচালনের জন্য জেলা বোর্ডের হস্তে এককালীন ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের উপাধি-তালিকায় ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে

"নাইট" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৬—৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতব্যাপী যে দুর্ভিক্ষ হয় মহারাজা তৎপ্রশমনকল্পে প্রথমে ১০ হাজার টাকা,পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্যর আর্থার হ্যাভলক মহারাজের নিমন্ত্রণে ববিলিতে আসিয়া ভিক্টোরিয়া টাউন হলের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ভিজাগাপটমের অধিবাসীদিগের অনুরোধে মহারাজা সাম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে একটি টাউন হল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তিগত গুণের জন্য ইঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করা হয়। এই উপাধিপ্রাপ্তির স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তিনি ববিলিতে মহারাণী ফার্ষ্ট গার্ল স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাণীর মৃত্যুর পর তিনি ববিলিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুড়ি হাজার টাকা মহারাণীর স্মৃতি-রক্ষা কল্পে নানা সভা-সমিতিতে দান করেন।

১৯০২ সালে মহারাজ মাদ্রাজ প্রদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারত সম্রাটের দরবার-উপলক্ষে লণ্ডনে যান। এবারও তিনি বাকিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হন। দরবার-দিনে মহারাজ ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ সম্মুখের আসনে উপবেশন করেন। ডিউক অফ মার্লবরো, ওয়েষ্টমিনিষ্টার, নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ড ও সামারসেট, মার্কুইস্ অব ল্যান্‌স্‌ডাউন, মার্কুইস্ অব সল্‌স্‌বেরী, আর্ল রবার্টস্, আর্ল নর্থব্রুক প্রভৃতি যে সমস্ত ভোজ দেন তিনি সেই সকল ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই দরবারের স্মৃতি-রক্ষার্থ মহারাজ স্থানীয় হাসপাতালের সংলগ্ন একটি ওয়ার্ড নির্ম্মাণ করেন। ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবারে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা "Advice to the Indian Aristocracy" নামক একখানি পুস্তক লেখেন এবং মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড এম্পথিলকে তাহা উৎসর্গ করেন। ১৯০৬ সালে মহারাজা ২৫ বৎসর শাসন শেষ করেন এবং উপহারস্বরূপ ২৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে

পার্ব্বতীপুরমে তিনি এডওয়ার্ড হল নামে একটি হল তৈয়ারী করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মাদ্রাজের শাসন পরিষদে প্রথম দেশীয় সদস্য নিযুক্ত হন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণবশতঃ তিনি পরবর্ত্তী বৎসরে উক্ত পদ ত্যাগ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি দিল্লীর করোনেশন দরবারে নিমন্ত্রিত হন। তথায় তিনি জি-সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। দিল্লী দরবারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তিনি ববিবিলি রেলওয়ে ষ্টেশনে জর্জ্জ বিশ্রামাগার স্থাপন করেন এবং রজমে "জর্জ্জ করোনেশন হল" নামে একটি হল নির্ম্মাণ করেন। উতকামন্দে মহারাজা ললি ইন্‌ষ্টিটিউট নামে যে ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইবা মাত্র মহারাজা প্রথমে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দেন এবং নিজেকে ও নিজ পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধের জন্য উৎসর্গীকৃত করেন। ১৯১৬ সালে মহারাজা লর্ড হার্ডিঞ্জ লাইব্রেরী হল তৈয়ারী করেন এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ জমিদার-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

৬ই নভেম্বর তারিখে মহারাজ জমিদারীর ভার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড জয়পুর যাইবার পথে ববিবিলিতে পদার্পণ করেন। ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে মহারাজ Most Excellent Order of the British Empire উপাধি লাভ করেন।

মহাত্মা কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বংশ

এই বংশ ভরদ্বাজগোত্র-সম্ভূত। শ্রীহর্ষ হইতে এই বংশের উদ্ভব। বাটীতে যে কুলপঞ্জিকা আছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে, রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাস ও অন্নদা-মঙ্গল-রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। সেখানে কৃত্তিবাসের জন্মভূমি। তথায় কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। তাহার পর এই বংশের একজন পূর্ব্বপুরুষ খাইমেড়েতে গিয়া বাস করেন। তাহার পর একজন পূর্ব্বপুরুষ বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুরে বসবাস করেন। বাঁকুড়া জেলা হইতে এই বংশের লোক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যাইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুরে রায় বাহাদুর পারদাকিঙ্করের বৃদ্ধ প্রপিতামহ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাস ছিল। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার দেওয়ান ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার বংশকে বাঁকুড়া জেলার লোকে "দেওয়ান-বংশ" বলে।

চণ্ডীচরণের দুই পুত্র—

(১) দেওয়ান কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(২) দেওয়ান তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কালীপ্রসাদ বীরভূম জেলার দেওয়ান ছিলেন। কালীপ্রসাদের কনিষ্ঠ তারিণীপ্রসাদ বাঁকুড়া জেলার দেওয়ান ছিলেন। কালীপ্রসাদ বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিতেন। তিনি ভক্ত, সাধক, পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার "কবিচঞ্চু" উপাধি ছিল। তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির অনেক স্থানে আছে এবং ঐ সমস্ত ঠাকুরের সেবা

নিয়মিত চলিতেছে। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ অর্থ পরার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দাতা বীরভূম জেলায় অল্প দৃষ্ট হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যহ ঢোল দিয়া অভুক্ত দীন-দরিদ্রকে অন্ন দান করিতেন। ইহা তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। তিনি কালীতত্ত্ব সুধাসিন্ধুতন্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তান্ত্রিক মতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও তাঁহার ন্যায় সাধক সেই সময় বিরল ছিল। তিনি ৺কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভজাত ছয় পুত্র ছিল।

প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র—পূর্ণানন্দ, কুলদানন্দ ও উমেশানন্দ; দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র—তারকানন্দ, রমেশানন্দ ও মহেশানন্দ। উপরোক্ত ছয় পুত্রের মধ্যে কুলদানন্দ বংশের শিরোভূষণ ছিলেন। তিনি সাধক, দাতা ও বিদ্বান্ ছিলেন। কুলদানন্দ প্রথমে মুনসেফ ছিলেন। তিনি পরে সবজজ হইয়াছিলেন। চাকুরীর শেষ সময় আলিপুরের সবজজ ছিলেন ও সেই স্থান হইতে পেন্‌সন লন। কুলদানন্দবাবু হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর পিতামহ বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী দোলগোবিন্দমণিকে বিবাহ করেন। বাবু বিপ্রচরণ হেতমপুর রাজষ্টেটের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কুলদানন্দের একটী মাত্র পুত্র ছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কুলদানন্দ বাবু তাঁহার পুত্র দক্ষিণারঞ্জনের ও শ্বশুর বাবু বিপ্রচরণের সহায়তায় ও নিজ উপার্জ্জিত অর্থে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। বাবু বিপ্রচরণও কুলদানন্দের পত্নী দোলগোবিন্দকে মূল্যবান সম্পত্তি দিয়াছিলেন। কুলদানন্দবাবু প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ৺শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া বঙ্গাব্দ ১২৪৩ সালের ৩০শে চৈত্র কালীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই অর্পণ প্রকৃত দেবোত্তর। এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে,কি সম্পত্তির লভ্যাংশে তাঁহার বংশধরগণের কোনরূপ স্বত্ব কি

স্থায়িত্ব নাই। এইরূপ কালীসেবা বাঙ্গালায় নাই। মৎস্য কি মাংস কি সিদ্ধ চাউল সেবায় দেওয়া চলে না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ আতপ চাউলের অন্ন ও নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্য প্রত্যহ প্রস্তুত হয় ও প্রত্যহ ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিত, মুহুরী, পাচক প্রভৃতি ছাড়া দশজন ব্রাহ্মণ আহার করিতে পান। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৵০ দুই আনা হিসাবে পাঁচ সিকা দক্ষিণা প্রত্যহ দেওয়া হয়। ঐ দশজন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪ জন গরীব ছাত্র প্রত্যহ কালীবাড়ীতে প্রসাদ ও প্রত্যহ প্রত্যেকে ৵০ আনা হিসাবে দক্ষিণা পাইয়া থাকে। এই কালী-বাড়ী অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও লক্ষাধিক স-দক্ষিণা ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গিয়াছে। অনেক গরীবের সন্তান ৺কুলদানন্দ বাবুর কৃপায় লেখাপড়া শিখিয়া সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। ঐ দরিদ্র ছাত্রদের অর্থাৎ কালীবাড়ীর charity boyদিগের মধ্যে কেহ শিক্ষকের কাজ করিতেছেন; দুই তিন জন সরকারের বড় চাকুরী করিতেছেন; কেহ আবার গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি লাভও করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর এইভাবে সেবা ও পরোপকার চলিতেছে। কুলদানন্দবাবু তাঁহার বিষয়ের মধ্যে যে বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও লাখরাজ তাহাই শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কুলদানন্দ বাবুর পৌত্র অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট সেসন্স জজ রায় বাহাদুর পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বাবু কুলদানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺কালীঠাকুরাণীর সেবায়েত। কুলদানন্দবাবুর একমাত্র পুত্র দক্ষিণারঞ্জন ভক্ত, সাহিত্যিক, সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা ও দয়ার সাগর ছিলেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বীরভূমে মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া "দিবাকর" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। দক্ষিণাবাবু যে অভিধান ("শব্দজ্ঞান-রত্নাকর") প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ-ভাষার এক অভাব পূর্ণ হইত। ঐ অভিধান Webester's Dictonaryর

মত বাঙ্গালা অভিধান। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল যে, তিনি অন্যের সাহায্য-ব্যতিরেকে প্রত্যেক শব্দ কোন্ পুস্তকে কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন ও সেই অংশ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। দক্ষিণাবাবু কবিও ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে অপূর্ব্ব "স্বপ্নকাব্য" প্রণয়ন করেন। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের 'বঙ্গদর্শনে' ঐ পুস্তকের সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল।

দক্ষিণাবাবুর সহিত কবিবর মাইকেল মধুসূদনের বিশেষ পরিচয় ছিল। মাইকেল যখন হাঁসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে মাইকেল যাহা বলিয়াছিলেন তাহা "মধুস্মৃতি"তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দক্ষিণাবাবু 'পদ্যসার' নাম দিয়া একটী Poetical Selection প্রকাশ করেন ও প্রত্যেক কবিতার নীচে দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। অনেক দিন ঐ পুস্তক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। দক্ষিণাবাবু বৈষ্ণব কবিদের প্রায় সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন ও প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের উৎকৃষ্ট পদ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। দক্ষিণাবাবু বীরভূম জেলার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও সিউড়ি মিউনিসিপালিটীর অবৈতনিক চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি অনাথের বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইয়া কেহ কখনও নিরাশ হয় নাই শুনিয়াছি। দরিদ্র-আতুরের সেবা তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। তিনি সাধক ও দাতা কুলদানন্দের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তিন পুত্র রাখিয়া যান।

১ম পুত্র—কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

২য় পুত্র—রায় সারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

৩য় পুত্র—জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

জ্যেষ্ঠ পুত্র কামদাকিঙ্কর অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি জজ্-

কোর্টের উকীল হইয়াছিলেন কিন্তু অল্পবয়সে অর্থাৎ উকীল হওয়ার দুই তিন বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন।

কামদাবাবু দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। সেই দুই পুত্রের মধ্যে এক পুত্র জীবিত আছেন। কামদাবাবুর ঐ পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত অমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল। অমিতা বাবু সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি জজকোর্টের উকীল।

দক্ষিণাবাবুর দ্বিতীয় পুত্র পারদা বাবু প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন ও পরে মুনসেফ্ ও সবজজ হইবার পর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯২৪ সালে রঙ্গপুর হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ১৯২৬ সালের ৩রা জুলাই "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। পারদাকিঙ্কর বীরভূম জেলা স্কুলের গরীব ছাত্রদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য দানের জন্য গভর্ণমেণ্টের হাতে তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রত্যেক মাসে ১০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি (প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে) উৎকৃষ্ট ছাত্রকে দেওয়া হয়।

যে ছাত্রকে ঐ বৃত্তি দেওয়া হয় তাহার নাম "পারদাকিঙ্কর স্কলার"। উপরোক্ত বৃত্তি ভিন্ন ঐ টাকার সুদ হইতে প্রত্যেক বৎসর দুইটী রৌপ্য পদক বীরভূম জেলার স্কুলের ছাত্রদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পারদা-কিঙ্করের পিতা ৺ দক্ষিণারঞ্জনের নামে ১৫৲ টাকা মূল্যের একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হয়। বীরভূম সরকারী বিদ্যালয় হইতে যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম হয় তাহাকে দক্ষিণারঞ্জন রৌপ্য পদক দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদক একই মূল্যের পারদাকিঙ্করের মাতা মনোমোহিনীর নামে দেওয়া হয়। বীরভূম সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান্ ও সুশীল তাহাকে পদক

দেওয়া হয়। উপরোক্ত ৩০০০৲ টাকা ব্যতীত পারদাকিঙ্কর অন্ধ, আতুর, নিরাশ্রয় ও বিধবাদেরও সাহায্যকল্পে ৬৫০০৲ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন।

পারদাকিঙ্করের পাঁচ পুত্র—

প্রথমা পত্নী চমৎকারমোহিনী দেবীর গর্ভজাত চারি পুত্র।

দ্বিতীয়া পত্নী চম্পকলতা দেবীর গর্ভজাত এক পুত্র ও তিন কন্যা।

পারদাকিঙ্করের ১ম পুত্র—পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল; ইনি মুন্সেফ।

২য় পুত্র—সবিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি, এম-বি পাশ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

৩য় পুত্র অতুলারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বি-এস্-সি পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম হওয়ার পর প্রথম আইন পরীক্ষা ও এম-এস্‌সি পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম-এস্‌সি পরীক্ষা দেওয়ার পর অতুলারঞ্জন Bengal Civil Service Competition Examination দিয়া ৩০০৲ টাকা বেতনে প্রবেশনার Income Tax Officer হইয়াছিলেন। তাহার পর একবৎসর মধ্যে অতুলারঞ্জন Language Examination ও সমস্ত ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা পাশ করিয়া ঐ চাকরীতে পাকা হইয়াছেন। অতুলারঞ্জন এখন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার ইনকমট্যাক্স অফিসার।

৪র্থ পুত্র—অজিতারঞ্জন গত বৎসর Physiologyতে এম্-এস্‌সি পরীক্ষা দিয়া First Class First হইয়াছেন ও Preliminary Law Examinationএ First Class পাইয়াছেন। অজিতারঞ্জন এখনও আইনের শেষ পরীক্ষা দেন নাই।

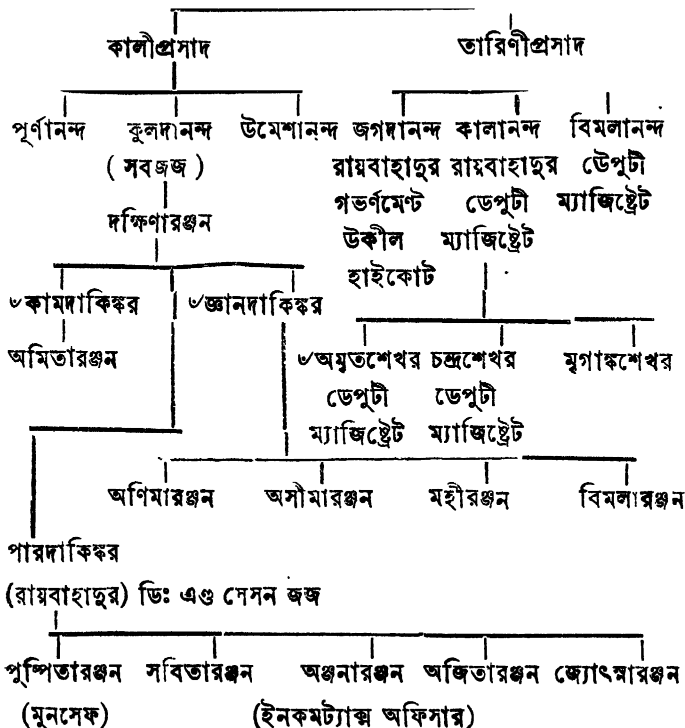
পারদাকিঙ্করের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম জ্যোৎস্নারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। জ্যোৎস্নারঞ্জন মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়িতেছে।

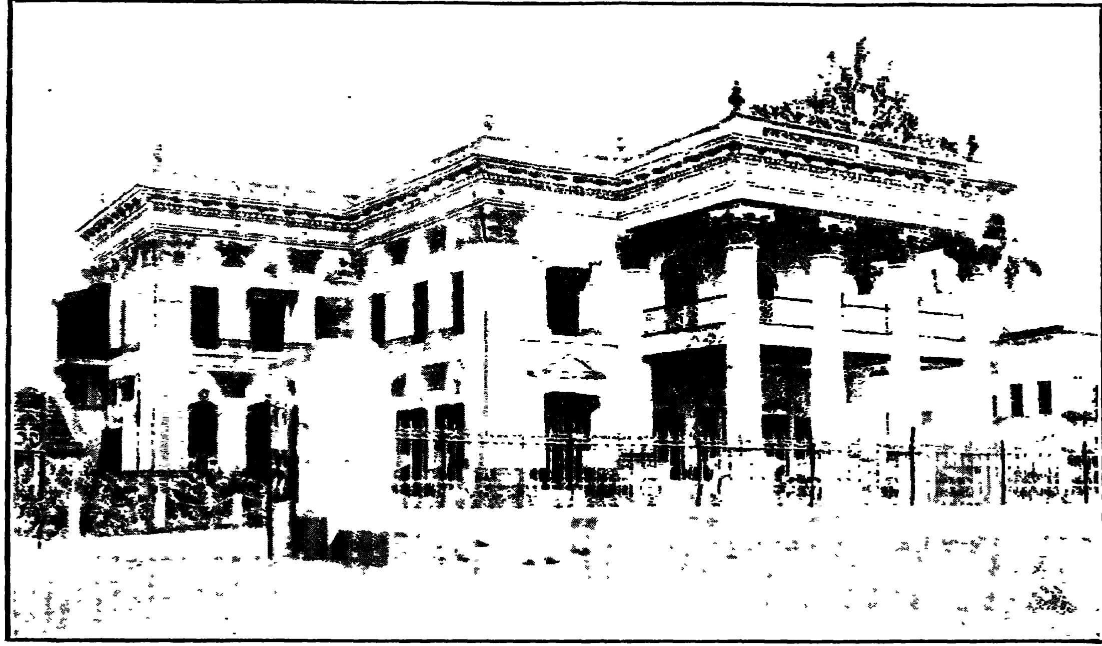
পারদাকিঙ্করের কন্যাদের নাম—(১) কল্যাণী দেবী (২) কমলা দেবী (৩) ইন্দিরা দেবী।

দক্ষিণারঞ্জনের তৃতীয় পুত্র ৺জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় সর্ব্বগুণাধার ছিলেন। তিনি বীরভূমের সকল সাধারণ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। জ্ঞানদাবাবু মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও পরে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। ৺জ্ঞানদা বাবু বীরভূম জেলা কোর্টের উকীল ছিলেন। বীরভূম জেলা বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রের স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না দেখিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুরুসদয় দত্তের চেষ্টায় ও যত্নে যখন বেণীমাধব ইন্‌সষ্টিটিউট খোলা হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব জ্ঞানদাবাবুকে ঐ বিদ্যালয়ের অনারারী সেক্রেটারী করেন। জ্ঞানদাবাবু বীরভূম "Cattle Fair and Exhibition"এর কার্য্য অনেক দিন যাবৎ অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিনখানি প্রতিকৃতি সাধারণ স্থানে দেওয়া হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি সিউড়ি রামরঞ্জন টাউন হলে রহিয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বীরভূমে আসিয়া জ্ঞানদাবাবুর ঐ প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন। দ্বিতীয় প্রতিকৃতি বেণীমাধব ইনষ্টিটিউটে দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রতিকৃতি জ্ঞানদাবাবুর নিঃস্বার্থ কার্য্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। তৃতীয় প্রতিকৃতি মিউনিসিপাল কাউন্সিল চেম্বারে দেওয়া হইয়াছে। ইহাও তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। মৃত্যুর সময় জ্ঞানদাবাবুর বয়স মাত্র ৪৪।৪৫ বৎসর হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে তাঁহাকে সকলে বীরভূমের শীর্ষস্থান দিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। জ্ঞানদাবাবু বহু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলেন নাই। তাঁহার শত্রু ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে সকলে বলিয়াছিল যে, জ্ঞানদাবাবু দেবতা ছিলেন। জ্ঞানদাবাবু চারি পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম অণিমারঞ্জন, দ্বিতীয় অসীমারঞ্জন, তৃতীয় মহিমারঞ্জন ও চতুর্থ বিমলারঞ্জন। অণিমারঞ্জন ও অসীমারঞ্জন বি-এ ও অপর দুইটী বীরভূম জেলা স্কুলে পড়িতেছে।

চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়





" মণ্ডল ভবন— "

নবাবগঞ্জের মণ্ডল পরিবার

-:*:-

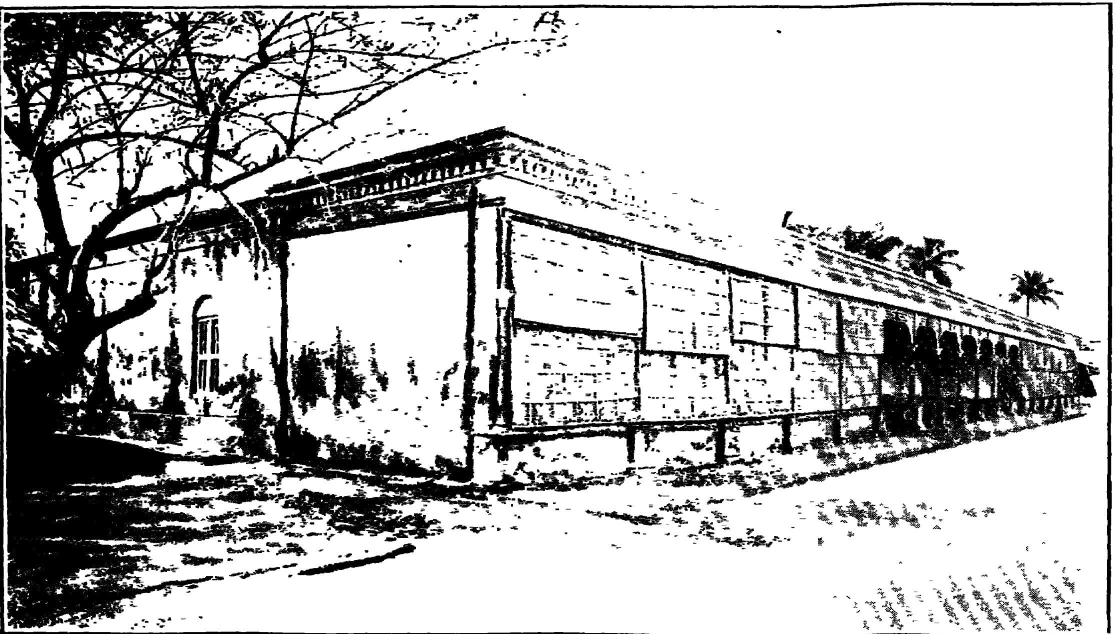
বঙ্গভূমির অন্তর্গত জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতা মহানগরীর নিকটস্থিত গঙ্গার পূর্ব্বকূলে স্থাপিত নবাবগঞ্জ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামের উত্তরে অবস্থিত ইছাপুর, ভারত গভর্ণমেণ্টের বন্দুকের কারখানার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন; দক্ষিণে পলতায় কলিকাতা কর্পোরেসনের বিরাট জলকল, কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের ঘোড়দৌড়ের মাঠ, খিতাড়া গ্রাম, বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট ও বড়লাট্ বাহাদুরের উদ্যান এবং বাটী; এবং পশ্চিমে ভাগীরথী নদী। প্রাচীন নবাবগঞ্জের গৌরব আজিও যাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন সেই নবাবগঞ্জের বৈশ্য সাহা জাতি উদ্ভূত কৌসিকি গোত্রস্থিত বৈষ্ণব ধর্ম্মাচারী মণ্ডল পরিবার বিগত শতাব্দী হইতে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে যেরূপ মুক্তহস্ততার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের যশঃ এবং বংশগৌরব দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে এবং ভারতের নানাস্থানে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেই বংশের পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের মধ্যে ৺বাঞ্ছারাম মণ্ডলের প্রপৌত্র ৺পঞ্চানন্দ মণ্ডলের পৌত্র এবং ৺রামগোপাল মণ্ডলের পুত্র স্বনামধন্য ৺রসময় মণ্ডল মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। চাউল, দাউল, কলাই, লবণ ও পাট ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যাদির বঙ্গের নানাস্থানে তাঁহার বিস্তৃত কারবার ছিল। তিনি হলধর, শ্রীধর, গঙ্গাধর এবং বংশীধর এই চারি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। অধ্যবসায়-শীল ও পরদুঃখকাতর শ্রীধর ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ তারিখে জন্ম

গ্রহণ করেন। হলধর ও গঙ্গাধর অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন; ফলে পরোপকারী শ্রীধর ও দানশীল বংশীধর কলিকাতায় ও বঙ্গের নানাস্থানে পিতার ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানারূপ কারবার প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ২৪ পরগণা, নদীয়া, মানভূম ও বর্দ্ধমানে জমিদারী আদি এবং কয়লা-ভূমি ইত্যাদি ক্রয় করেন এবং কলিকাতায় প্রভূত ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নবাবগঞ্জ গ্রামে তাঁহারা একটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন; তন্মধ্যে একটী অনাথালয় স্থাপন করেন। এই মন্দিরে ৺গোপীনাথ জীউ ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহারা দুই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তি হইতে যে আয় হয়, তদ্দ্বারা বিগ্রহের নিত্য সেবা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, অতিথি সৎকার এবং বার্ষিক উৎসব সমাধা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই দেব মন্দিরে যে উৎসব ও পর্ব্বাদি সম্পন্ন হয় তাহা অতিশয় আড়ম্বরের সহিতই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর শরৎকালে শ্রাবণ ভাদ্র মাসের ঝুলন উৎসবের সময় যে আমোদ প্রমোদ হয়, তাহার তুলনা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এতদুপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড মেলা মাসাবধিকাল বসিয়া থাকে এবং কয়েক দিবস ধরিয়া থিয়েটার, যাত্রা, নাচগান, দেশীয় ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি হইয়া থাকে। বহু সহস্র নরনারী বঙ্গের নানাস্থান হইতে এই ঝুলন উৎসব এবং মেলা দেখিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে দেবস্থানের চতুষ্পার্শ্ব এবং রাস্তা ঘাট প্রভৃতি বিরাট জন-সমুদ্রে পরিণত হয়। প্রতি বৎসর এই মেলায় প্রদর্শনের জন্য রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সামাজিক ও পারিবারিক কৌতুক বিষয়ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।



স্বর্গীয় শ্রীধর মণ্ডল—

জন্ম—১৭মার্চ্চ ১৮০৭ মৃত্যু—২০ এপ্রিল ১৮৯৪



শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীউ ঠাকুর বাটী—

নানাস্থান হইতে দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা এই মেলায় আসিয়া নানা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বারাসতের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার য়্যাসলী ইডেনের অনুরোধে শ্রীযুক্ত শ্রীধর মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত বংশীধর মণ্ডল মহাশয়দ্বয় বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নবাবগঞ্জ নদী তীর হইতে কাঁটালিয়া তেলিনীপাড়া পর্য্যন্ত ৫ মাইল বিস্তৃত একটী রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। এই রাস্তাটী নবাবগঞ্জ নদীতীর হইতে রেলওয়ে লাইন পর্য্যন্ত যাহাতে সর্ব্বদা সুসংস্কৃত অবস্থায় থাকে সেজন্য শ্রীরামপুর মহকুমায় কিছু সম্পত্তি ইঁহারা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে যে সৈন্যদল মোতায়েন ছিল, সেই সৈন্যদল কামান, বন্দুক ও অশ্বাদি লইয়া এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করায় রাস্তাটী অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছিল। ভারতের প্রধান সেনাপতির নিকট ঘটনাটি জ্ঞাত করায় তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিষ্টার ডব্লিউ এইচ্ গ্রীমূলে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের নিকটে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

"মহাশয়! আপনার বিবেচনার জন্য এই বিষয়টী আপনার গোচর করা যাইতেছে। এই জেলার মধ্যে বারাকপুরের উত্তরে নবাবগঞ্জের নদীতীর হইতে তেলিনীপাড়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে; এই রাস্তাটী পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তেলিনীপাড়ায় গিয়া এই রাস্তাটী নীলগঞ্জ রোডের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বাবু শ্রীধর মণ্ডল এবং বাবু বংশীধর মণ্ডল এই রাস্তাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা নবাবগঞ্জের অধিবাসী। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বারাসতের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার য়্যাসলী ইডেনের অনুরোধে তাঁহারা এই রাস্তাটী

নির্ম্মাণ করেন। রাস্তাটী নির্ম্মাণ অবধি ইহার নির্ম্মাতারা প্রতি বৎসর ইহার সংস্কার করিয়া আসিতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ২০ হাজার টাকা এই রাস্তার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। রাস্তাটী ফেরীফাণ্ড, ঘোষপাড়া রোড ও রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নদীতীর হইতে রেলওয়ে লাইন পর্য্যন্ত এক মাইল ব্যাপী রাস্তা পাকা। রেলওয়ে লাইন হইতে জাফরপুর পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাইল ব্যাপী রাস্তাও পাকা, কিন্তু তাহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। এই রাস্তার পর একটা কাঁচা রাস্তা আছে। বারাকপুরে যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত থাকে, তাহারা জাফরপুরে কুচকাওয়াজ শিক্ষা করে, ঘোষপাড়া রোড হইতে জাফরপুর পর্য্যন্ত এই সমস্ত সৈন্যদের অশ্ব, কামান প্রভৃতি যুদ্ধ সরঞ্জাম লওয়ার ফলে রাস্তাটী এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়া লোক চলাচল কষ্টকর। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনাটী ঘটে এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যে ভদ্রলোকদের ব্যয়ে এই রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং রাস্তাটীর সংস্কার হইতেছিল, তাঁহারা প্রধান সেনাপতির নিকট দরখাস্ত করিয়া রাস্তাটীর সংস্কার সাধন ও যখন ভিন্ন রাস্তা রহিয়াছে, তখন উক্ত পথ দিয়া সেনাদলের গমনাগমন বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিন হাজার টাকা হইলে রাস্তাটির সংস্কার হইতে পারে বলিয়া মোটামুটি হিসাব করা গিয়াছে। কিন্তু প্রধান সেনাপতি জানাইয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে চান না।

প্রধান সেনাপতির এই আদেশ পাইয়া উপরোক্ত ভদ্রলোকগণ রাস্তাটির সংস্কার সাধন আর করিতেছেন না। আমি যখন নবাব্-গঞ্জের নিকট তাঁবুতে ছিলাম, তখন এই ব্যাপারটী ৺শ্রীধর মণ্ডলের পুত্র অদ্বৈতচরণ মণ্ডল মহাশয় আমার গোচর করেন। আমি রাস্তাটী পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করি এবং দেখিতে পাই যে, রাস্তায় মধ্যে মধ্যে



স্বর্গীয় রায় অদ্বৈত চরণ মণ্ডল বাহাদুর—

জন্ম—২৬ এপ্রিল ১৮৪৭ মৃত্যু—৪ জানুয়ারী ১৯২৬

এরূপ গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে যে গাড়ী ঘোড়া লইয়া এই রাস্তা দিয়া গমনাগমন অসম্ভব। নবাবগঞ্জের মণ্ডলেরা অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। তাঁহারা নানা প্রকার সৎকার্য্য করিয়াছেন। এই রাস্তাটী নির্ম্মাণ ছাড়া তাঁহারা একটী অনাথাশ্রম, একটী ডিস্‌পেন্সারী ও একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্কুল গৃহটী নির্ম্মাণ করিতে ১৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্কুলটির স্থায়িত্বকল্পে তাঁহারা ১৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে আমি মনে করি তাঁহারা প্রধান সেনাপতির নিকট যে আবেদন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সরকারী কর্ম্মচারীর অনুরোধে এই রাস্তাটি দুই ভাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এবং সৈনিক বিভাগ কর্ত্তৃক রাস্তাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহারা অবশ্যই ক্ষতিপূরণের আশা করিতে পারেন। কিন্তু সরকার হইতে যে উত্তর প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা দুই ভ্রাতা সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই, এমন কি শ্রীধর মণ্ডল মহাশয়ের পুত্রও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য না করিলে, আমার মনে হয় ইঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং আমি আশা করি আপনি গভর্ণমেণ্টের নিকট উপরোক্ত বিষয় উপস্থিত করিয়া প্রধান সেনাপতি যাহাতে বিষয়টির সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল প্রার্থনা করেন যে, যেহেতু সৈন্য বিভাগ কর্ত্তৃক রাস্তাটি নষ্ট হইয়াছে, অতএব উহা সৈন্য বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইবে; আর যদি সৈন্য বিভাগ উহার সংস্কার না করেন, তাহা হইলে রাস্তাটির সংস্কারের জন্য অদ্বৈতচরণ মণ্ডল মহাশয়ের হস্তে প্রয়োজনানুরূপ টাকা দিতে হইবে। অদ্বৈতবাবুর পিতা ও খুল্লতাত যে জনহিতৈষিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ দেখাইতে ইচ্ছুক, কাজেই তাঁহার এই সৎ প্রবৃত্তিতে কোনরূপ

বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি আশা করি সৈন্য বিভাগীয় গভর্ণমেণ্ট বিষয়টির পূর্ণ বিবেচনা করিবেন।

বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডলের নিকট ইহার নকল পাঠান হইল। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৭শে তারিখের ১৬৪ নম্বর তাঁহার চিঠি অনুসারে উক্ত নকল পাঠান হইল।

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ এইচ্ গ্রিমলে

২৪ পরগণা জেলা বোর্ড
আলিপুর ১৫ই এপ্রিল
১৮৮৯ সাল

(ম্যাজিষ্টেট ও চেয়ারম্যান)

No. 20 D. B.

From

W. H. Grimley Esqr.

Magistrate & Chairman of the District Board, 24-Pargs.

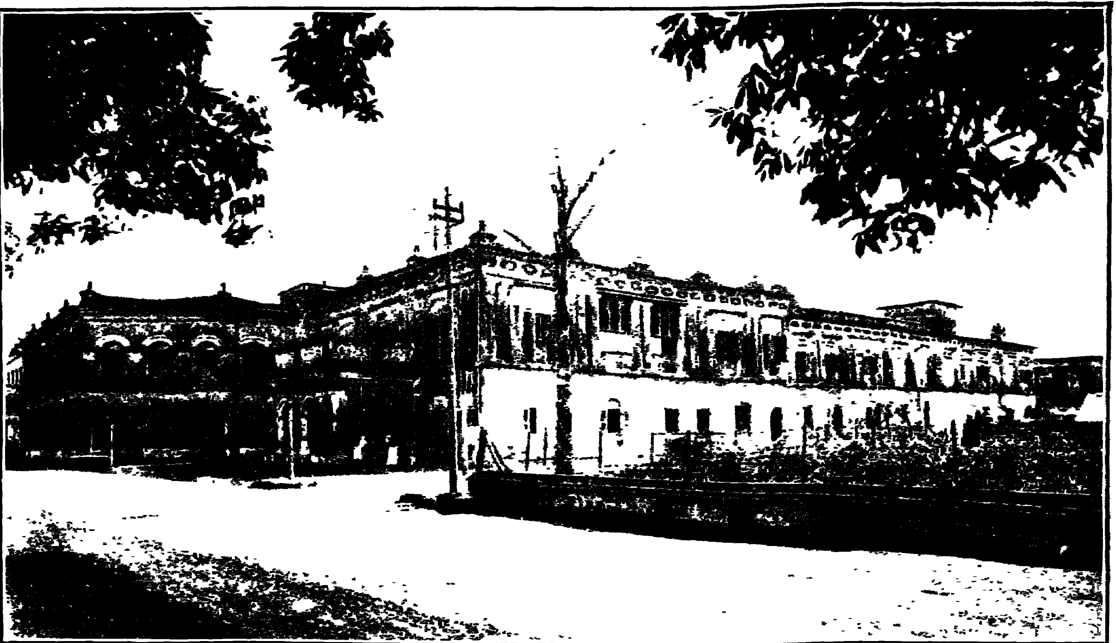
To

The Commissioner of the Presidency Division, Calcutta.

Dated Alipur, the 13th April 1889.

Sir,

I have the honour to submit the following matter for your consideration and order. There is a road in this District a little to the north of Barrakpur leading from the river-side at Nawabganj to Telipara, a distance



মণ্ডল বাটী

of about 5 miles, where it joins the Nilganj Road, passing from Barrackpur to Baraset. This road was constructed by Babu Sridhar Mandal and Babu Bansi Dhar Mandal, residents of Nawabganj, in 1859, at the instance of Sir Ashley Eden who was then Magistrate of Baraset. The road since its construction has been kept in good repair for many years by the gentlemen who made it, and they had from time to time incurred an expenditure nearly amounting to Rs 20,000. The road crosses the Ferry fund, Ghosepara Road and the Railway and the portion of it about a mile in length, between the river and the Railway is metalled and is in excellent order. The next portion from the Railway to Jaffarpur, about two miles, is also metalled but is in very bad condition. Beyond the road is a fairly good kutcha road.

Jaffarpur is the practising range of the Artillery, stationed at Barrakpur, and it appears that a few years ago the heavy guns and horses frequently made a passage of this road from the Ghosepara road to Jaffarpur, and the damage done to the road was so great as to render it almost impassable, especially during the rains. This occured in 1882, and in 1883 the gentlemen at whose expense the road was constructed and kept in repair, represented the matter to His Excellency the Commander-in-chief and petitioned that he would "issue order for the proper repairs of the road in question, and for stopping the passage of the artillery guns to pass through the road when a separate road has been properly constructed by Government for such purpose, running north to Chandanpukar and

Jaffapur." The cost of the repairs is estimated at Rs 3000. But the only reply received to the representation was that "His Excellency the Commander-in-chief declines to interfere in the matter."

In consequence of this order the said gentlemen have ceased to do anything towards the repairs of the road between the Railway and Jaffarpur, and when I was recently in camp in the neighbourhood of Nawabganj Babu Adoita Charan Mandal (the son of Sridhar Mandal) who now represents the family, brought the matter to my notice. I inspected the road and found that it was in very deep ruts and almost impassable for wheel traffic. I also ascertained that it is no longer, or at any rate very seldom, used by the artillery guns. The Mandals of Nawabganj are a very respectable family who have acted liberally in many ways. Besides constructing the road in question, they have built an alms-house, a dispensary and a school. The last mentioned building is a very substantial edifice costing Rs. 18000 and besides providing this sum the two brothers also contributed Rs. 15000 for the maintenance of the school, which is now one of the most flourishing educational institutions in this District. On these grounds I think that the representations which they made to His Excellency the Commander-in-chief was deserving of greater consideration than it received. The road having been constructed and repaired at the cost of the two brothers at the instance of a Government official, the Magistrate of the District, it was natural and reasonable that they should expect some compensation

from Government when damage, beyond ordinary wear & tear, was done by the Military Department. The answer given to their petition failed to satisfy the brothers, and it does not please the son of Sridhar Mandal, the present representative of the family. In fact it is calculated to damp the liberal energies of a public spirited man who has already shown signs of a readiness to promote works for the public good. I am convinced that unwillingly an injustice has been done and as it is never too late to right a wrong, I beg to request that you will lay the matter before Government in view of a fresh representation being made to His Excellency the Commander-in-chief. All that Babu Adita Charan Mandal desires is that the Military Department who damaged the road will repair it, or provide him with the necessary funds for the purpose. The spirit of liberality which characterised public actions of the father & uncle is likely to be continued in the son if not unduly checked and I earnestly hope that Government in the Military Department may be induced to reconsider the former order.

I have &c.
(Sd): W. H. Grimley.
Magistrate & Chairman.

Memo: No. 21 D. B.

Copy forwarded to Babu Adita Charan Mandal with reference to his letter No. 164 dated 27th February 1889. The papers received with his letter are returned to him.

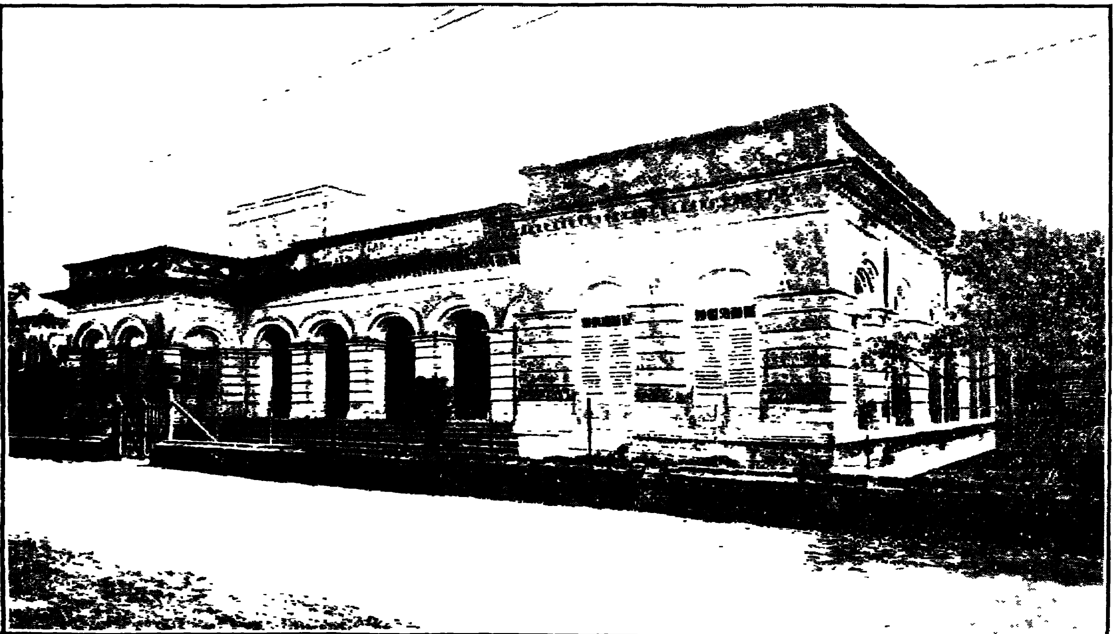
24-Pargs Dist. Boards Office (Sd) W. H. Grimley,
Dated Alipur, the 13th Apr. 89. Magistrate & Chairman.

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাবু শ্রীধর মণ্ডল ও বাবু বংশীধর মণ্ডল নবাবগঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা স্কুলটীর রক্ষাকল্পে ১৫ হাজার টাকা প্রদান করেন এবং ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে স্কুলটীর জন্য একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে প্রস্তাব হয় যে স্কুল বাড়ীটি তদানীন্তন ছোটলাট স্যার য্যাসলী ইডেন উদ্বোধন করিবেন। বাবু বংশীধর মণ্ডল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডলের সহিত লাট সাহেবের নিকট যান। তখনও অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হওয়ায় ছোটলাট অত্যধিক গ্রীষ্মের উত্তাপবশতঃ স্কুলটির উদ্বোধন জন্য আসিতে পারেন নাই; তবে তিনি বাবু বংশীধর মণ্ডলের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি দেন।

বেলভেডিয়ার
৮ই এপ্রিল ১৮৮২

বাবু বংশীধর মণ্ডল আমার একজন পুরাতন বন্ধু। আমি যখন বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন তিনি আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নবাবগঞ্জ হইতে কাঁটালিয়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী অনাথ আতুরাশ্রম ও একটী ডিস্‌পেন্-সারী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহায়তায় একটী এণ্ট্রান্‌স স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে যদি শীত থাকিতে থাকিতে স্কুল গৃহটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়, তাহা হইলে আমি স্কুলটী পরিদর্শন করিব, কিন্তু এখন অত্যধিক গরম পড়ায় আমি স্কুলটী পরিদর্শন করিতে যাইতে পারিলাম না।

৮ই এপ্রিল ১৮৮২ } (স্বাক্ষর) য্যাসলী ইডেন।



শ্রীধর বংশীধর স্কুল।

"Belvedere"

"Babu Bansidhar Mandal of Nawabganj is an old friend of mine who gave me much assistance when I was Magistrate of Baraset. He very liberally constructed a road from Nawabganj to Katalia. He has built an alms-house, a dispensary and now has built with the assistance of his brother a school teaching up to the Entrance Standard. I wished to have visited the school and promised to do so if it was finished while the weather was cool, but the great heat now prevents my going so far."

April 8th 1882. (Sd) Ashley Eden.

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এ, ডবলিউ ক্রফট্ এম্ এ, স্কুল গৃহটীর উদ্বোধন করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহাতিশয্যে স্কুলটীর নাম "শ্রীধর বংশীধর স্কুল" রাখা হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড রিপন স্কুলটী পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রগণের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করেন। বড়লাটের স্কুল পরিদর্শন স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত ইঁহারা "শ্রীধর বংশীধর রিপন লাইব্রেরী" নামে একটী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং লাই-ব্রেরিটীর স্থায়িত্ব বিধানকল্পে তিন সহস্র টাকা দান করেন। ইহা ছাড়া বিশেষ পারিতোষিক দিবার জন্য তাঁহারা আরও তিন হাজার টাকা দান করেন। এই পারিতোষিকের নামও "শ্রীধর বংশীধর রিপন বৃত্তি" রাখা হয়। এই বিদ্যালয় হইতে যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায়

প্রথম হয়, তাহাকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া এই বৃত্তি দেওয়া হয়। বড়লাটের পরিদর্শন স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা স্কুলে লর্ড রিপনের একটী মর্ম্মর প্রস্তর ফলক প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ডরিপন স্কুলটীর একজন পৃষ্টপোষক হন। ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া বড়লাট সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে লক্ষ করিয়া এই বক্তৃতা করেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় স্কুলটী পরিদর্শন করিতে পারিব। কিন্তু স্কুলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এখানে আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য—কাউন্সিলের আইন সচিব, শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত রহিয়াছেন (হাস্যধ্বনি) ইহাতে আমি একেবারে হতভম্ব হইয়াছি। আমি যদি কাল জানিতে পারিতাম যে আমাকে এরূপ সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি সারারাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা প্রস্তুত করিতাম (হাস্যধ্বনি)। শিক্ষা সম্বন্ধে আমি গত ৩০।৪০ বৎসর বাবৎ বক্তৃতা করিয়া আসিতেছি। শ্রোতৃগণ আমার মুখে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কাজেই আমি যদি আপনাদের আশানুরূপ বক্তৃতা করিতে না পারি, আশাকরি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। বাবু শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল এস্থানের শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করিয়া এই স্কুলটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, নবাবগঞ্জের অধিবাসীদের শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাঁহারা সরকারের নিকট টাকার জন্য দৌড়াদৌড়ি করেন নহে; কিন্তু নিজেরাই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। আমি এই দুই ভদ্র-লোককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছি। আমি শিক্ষা বিস্তার-কল্পে সর্ব্বদাই আগ্রহবান এবং আমি বিশ্বাস করি ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তার হইবে। কিন্তু এজন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ট্যাক্স বসাইয়া

এই অর্থ সংগ্রহ করা ভারতবাসী পছন্দ করে না। তবে কি উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে? শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে যদি দেশের মহানুভবগণ এজন্য দান করিতে আরম্ভ করেন। এই কারণেই আমি আজ এখানে আসিয়াছি এবং যে দুই ভদ্রলোক এই স্কুলটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি বারাকপুরকে অত্যন্ত ভালবাসি, বারাকপুরে আমার থাকিবার স্থান। বারাকপুরের স্কুলটীর প্রতি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাটগণ যেরূপ মমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ করি। নবাবগঞ্জের এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হয়ত বারাকপুরের স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু আমি সে জন্য একটুও দুঃখিত নহি। আমি শিক্ষা বিস্তার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ভালবাসি। সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলের নিকট বে-সরকারী ভদ্রলোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল বিদ্যমান থাকিয়া সুচারুরূপে তাহা চলে, ইহা আমি চাই। একথা যে আমার ব্যক্তিগত কথা বলিতেছি তাহা নহে। আমার বিশ্বাস শিক্ষা বিভাগের যাঁহারাই এখানে উপস্থিত আছেন তাঁহারাই আমার কথার প্রতিধ্বনি ও পোষাকতা করিবেন। আমার বিশ্বাস সে সময় বিশেষ দূরবর্ত্তী নয়, যখন ভারতের সর্ব্বত্র সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের সন্নিকটে বে সরকারী ভদ্রলোক দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত স্কুল সমূহ সমভাবে চলিতে থাকিবে। এই মাত্র স্কুলটীর যে রিপোর্ট পঠিত হইল, তাহা হইতে জানিতে পারিলাম যে স্কুলের যে একটী লাইব্রেরী ও একটী বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আমার নাম সংযোজন করা হইয়াছে। ইহাতে যে আমার উপর বিশেষ সম্মান দেখান হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। ভারতে শিক্ষা বিস্তারকল্পে যে কোন কার্য্যের সহিত আমার নাম জড়িত হউক, তাহা আমি অত্যন্ত সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করি এবং এই ভদ্রলোকেরা যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমি সম্মতি

প্রদান করিতেছি। আমাকে এই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত সে প্রস্তাবে সম্মত হইতেছি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, স্কুলটী বিদ্যমান থাকিয়া বালক বালিকাগণের শিক্ষা প্রদান করুক এবং যে দুই উদারহৃদয় ভদ্রলোক ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখুক।" (দীর্ঘআনন্দধ্বনি)

"Ladies and gentlemen,······I must say that I rise on this occasion with an unusual amount of trepidation. I thought that I was coming to this school rather in the position of a country gentleman who visits a village school in his neighbourhood & distributes the prizes, than in that of a public character. When I entered this room I found myself in the presence of most formidable assembly. My eye first fell upon my Hon'ble and learned friend, the Legal Member of...Council, and by his side I saw a yet more formidable individual, the president of the Education Commission, and then which was more alarming still, I observed in a corner of the room, the representatives of the Calcutta Press (laughter). This, I must say, took me altogether aback, and instead of this being, as I expected, a quiet gathering in a country school, I find Members of Council, representives of the Press, of the Foreign office and other public departments assembled here to meet me ; and then, beyond that, I have been called upon to discharge one of the most difficult duties which can

by any possibility fall to the charge of any man, namely to pronounce upon the respective and relative merits of youths, who, all of them performed their part so well as those who have recited before us this afternoon. However I must do my best. If I had known the audience I was about to address, I should, of course, have sat up last night and burn a large number of candles in preparing an elaborate oration (laughter) ; but if I am to speak the truth, I did nothing of the kind. I went quietly to bed in perfect innocence of what was to come. (laughter.),

I have been speaking now for between thirty and forty years upon the subject of education, and I suspect my audiences are nearly as tired of hearing me on that subject as I am speaking about it, and therefore, I hope that, on this occassion you wiil excuse me if I do not come up to your expectations. I can only say that I will do my best. I will not now trouble you with those—shall I say common-places—on the subject of education which we hear, haply as I think, in these days throughout the length & breadth not only of Europe but also of India ; but it seems to me that there is a feature connected with this school which is one so interesting and important that it will suffice for the few observations which I desire to address to you on this occasion. The circumstances under which this school has been founded. afford me, I must say, the highest gratification. I find here two gentlemen, Babus Sridhar and Bansidhar Mandal, who have come forward to supply at their own cost the wants of this neighbourhood. It appears to

have struck them that the people of Nawabganj were in need of a school. What did they do? They did not go to the Government and beg for a large amount of funds out of the public money with which the school might be erected; but they come forward with a generosity and public spirit which does them the highest honour. They said "We will do this for our friends & neighbours; we will found this school, and establish it among them that it may be for the lasting benefit of those among whom we ourselves have dealt" (Cheers). Now I can truly say that I derive the very greatest possible pleasure from seeing two native gentlemen taking this course. I feel, as is well known, the deepest interest in the question of education and I desire to see education in all its branches spread more widely throughout the land in India. But we all know that education can not be supplied without funds, and no one who has attended to this subject at all can doubt that, if the education of the people of India were to be made complete and full, it would require an amount of money which it would alarm the boldest financier to contemplate. I find, ladies and gentlemen, that all people throughout the world have a great dislike of taxation. An English Statesman once spoke of the people of England as having what he called an ignorant impatience of taxation. (laughter) Well, I always thought that was the characteristic of my countrymen; but I must say that I do not know any people in the world who have a greater dislike of taxation than the people of India (laughter), and I am quite surethat if

my Hon'ble friend Major Baring were to propose to supply the educational wants of this country thoroughly and completely by the imposition of the taxation which would be required for that purpose, his popularity would very speedily disappear. Well then how is the thing to be done? Our revenue is inelastic, the sources from which it is derived are very few. How is this great work to be accomplished? It can only be accomplished by private individuals coming forward and taking a share in it (loud cheers) and therefore, it has been to me a source of great pleasure to have had this opportunity of coming here to-day, and of marking in the clearest and most distinct manner in my power, my high appreciation of what has been done by these gentlemen in the establishment of this school. (cheers).

Ladies and gentlemen,—I feel, and have felt ever since I first came to Barrackpore, a great interest in the other school which exists at Barrackpore. I am very fond of Barrackpore as a residence, and have always felt an interest in the school there which has been supported by many successive Viceroys, I know that it may be said that the establishment of this School here at Nawabgunj may interfere with the attendance of the children at the Barackpore school. Probably to some extent it has, but I am a friend to competition to education, I believe that it is a great advantage that a school established and supported by the Government should have in its immediate neighbourhood another school established and founded

by private liberality to enter into competition with it, and keep it up to the mark. (cheers). I am quite sure that when I say that I do not speak only my individual opinion, but that view of the subject will be endorsed by those distinguished gentlemen connected with the education department whom I see here on the present occasion. You all know the valuable effects of competition in a matter of this kind, and I think the day is far distant when, as my friend Mr. Croft said on the last occasion on which he visited the school, the time may come when the education department will be superfluous, nevertheless, I think that it is a very good thing that Government school in all parts of the country should have keen competition to encounter with school established by private individuals. (cheers) Ladies and gentlemen, for these reasons I am very glad to have been able to come here to-day.

I find in the report just read that it is the intention of the gentlemen who have founded the school to found also in connection with it a library and a scholarship with which they have done me the honour to connect my name when I say that they have done me the honour I am not making use of an empty phrase. I do esteem it an honour to have my name connected with anything calculated to promote the spread of education in this country and I readily accept the proposals which these gentlemen have made (cheers)

I have been asked to become a patron of this institution. I shall very gladly do so, and I can truly say

that it is my most sincere wish that this school, founded with so much generosity, may continue, for many many generations, to confer large benefits on the children of this district, and to keep alive in the grateful memory of its inhabitants the names of the brothers Mandal. (Loud and continued cheers)".

স্কুলটী বর্ত্তমানে ২৪ পরগণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ মণ্ডল ও স্কুল কমিটীর চেষ্টায় স্কুলটী উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্কুলের সাহায্যে কর্ত্তাদের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ২০টী ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ মণ্ডল মহাশয় "স্কুলের পৃষ্ঠ পোষক" বলিয়া তাঁহার নাম ব্যবহার করিবার এবং লাইব্রেরীর পুস্তকে বড়লাটের পরিবারবর্গের প্রতিমূর্ত্তির ছাপ দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তদুত্তরে বড়লাট তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন :—

গভর্ণমেণ্ট হাউস

বারাকপুর

২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৩।

মহাশয়,

আপনার ২০শে তারিখের পত্রখানি আমি বড়লাটের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি। বড়লাট আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে, শ্রীধর বংশীধর বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহার নাম ব্যবহার করিতে দিতে বড়লাটের কোন আপত্তি নাই। লাইব্রেরীর পুস্তকেও

তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিতেছেন।

ভবদীয়—
এইচ্ ডবলিউ, প্রিমরোজ
বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী।

Government House.
Barackpore.
27th December 1883.

Sir,

I have received and laid before His Excellency the Viceroy and Governor General, your letter of 20th instant, and am directed to state that His Excellency has no objection to your using his name as patron of Sridhar Bansidhar School at Nawabganj in the annual reports of that institution, and also agrees to your using His Excellency's family crest on the covers of the books of the library founded in connection with that school in the manner indicated by you.

I am
Sir,
Yours obediently,
H. W. Primrose.
Private Secretary to the Viceroy.

Babu Adaita Charan Mandal,

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড রিপণের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বাবু শ্রীধর ও বংশীধর মণ্ডল স্কুল কমিটীর পক্ষ হইতে বারাকপুর পার্কে তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন :—

মহামান্য জর্জ্জ ফ্রেডেরিক্ স্যামুয়েল রবিনসন্ মার্কুইস্ অব্ রিপণ কে, জি, পি, সি, জি, এম্, এস্, আই, জি, এম্, আই, ই।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল—

"আমরা বারাকপুরনবাবগঞ্জের শ্রীধর বংশীধর স্কুলের কার্য্যকরী কমিটীর সদস্যগণ আপনার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আপনার নিকট এই বিদায় অভিনন্দন উপস্থিত করিতেছি। এদেশের অধিবাসীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য আপনার আন্তরিক চেষ্টায় আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আপনার উদার শাসনকালে বে-সরকারী লোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ সমূহকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। এদেশের শিল্প, কল-কারখানার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এদেশের মুদ্রাযন্ত্রের নষ্ট স্বাধীনতার উদ্ধার সাধন হইয়াছে এবং স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। যদি এই স্বায়ত্ত শাসন অনুযায়ী কার্য্য হয়, তাহা হইলে এদেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে।

আপনার শাসনাধীনে ভারতের নানা বিষয়ক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার উল্লেখ আমরা করিতে পারিতেছি না। আপনার স্মৃতি ভারতবাসীদের মনে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে।

আমরা বারাকপুরের অধিবাসীগণ আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, যেহেতু আপনি দয়া করিয়া শ্রীধর বংশীধর বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্কুলটী ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আপনার নিকট ঋণী। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক "শ্রীধর বংশীধর রিপন বৃত্তি" ও "শ্রীধর

বংশীধর রিপণ লাইব্রেরীর” সহিত আপনার নাম সংযোজিত করিতে অনুমতি দিয়া ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এদেশে শিক্ষার বিস্তার ও যেখানে স্কুলের অভাব তথায় স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিবার সাধু প্রবৃত্তি হইতে আপনি এই স্কুলটীর প্রতি এতাদৃশ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

অসময়ে আপনি এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য আমরা আমাদের গভীর দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা আশা করি, আপনি স্বদেশে ফিরিয়াও এদেশের ও বারাকপুরের উন্নতিকল্পে এইরূপ প্রযত্ন করিবেন।

উপসংহারে আমরা আপনার ও লেডী রিপণের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি এবং আপনারা নিরাপদে স্বদেশে গিয়া উপস্থিত হন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

নবাবগঞ্জ বারাকপুর
১৬ই ডিসেম্বর
১৮৮৪ সাল

শ্রীধর মণ্ডল
বংশীধর মণ্ডল } সভাপতিদ্বয়
অদ্বৈতচরণ মণ্ডল (অবৈতনিক সম্পাদক)

TO HIS EXCELLENCY THE MOST HON'BLE GEORGE FREDERICK SAMUEL ROBINSON MARQUIS OF RIPON K. G. P. C. G. M. S. I., G. M. I. E.

VICEROY & GOVERNOR GENERAL OF INDIA.

May it please your Excellency :—We the Executive Committe of the Sridhar Bansidhar School, Nawabganj (Barrackpore), on behalf of the community, beg most respectfully to approach your Excellency with this humble address on the eve of your Excellency's retirement from Viceroyalty of India. We are immensely grateful to your Excellency for your earnest and persistent efforts to promote the material & political advancement of the Natives of this country. Under the benign influence of your Excellency's rule, impetus has been given to pass education to PRIVATE ENTERPRISE, to INDIGENOUS ART & MANUFACTURES; the lost LIBERTY OF THE NATIVE PRESS has been restored and the foundations have been laid of that noble institution of LOCAL SELF GOVERNMENT, which, if probably fostered, will materially contribute to the political advancement of the Indian people.

We cannot recount the various and manifold blessings our country has received under your Lordship's wise and progressive administration and for these noble

acts, your Lordship's name will remain enshrined for ever in the hearts of a grateful people.

We as people of Barrackpore are proud that your Excellency has been pleased to bestow upon the cause of self-help in education by the gracious condesension with which your Lordship readily honoured the Sridhar Bansidhar School with your noble patronage. The stablity and permanence of the institution which owed its existence entirely to the munificence of private individuals has thus been secured by the dignity it has received from the association of your name with the foundation of a scholarship styled the "Sridhar Bansidhar Ripon Scholarship" and the establishment of a library called the "SRIDHAR BANSIDHAR RIPON LIBRARY". To honour thus a private institution your Lordship has been actuated solely by a kind sympathy with the backward condition of the people of this locality and by a desire to uplift the cause of education at a place where it was most needed.

We cannot allow this opportunity to pass without expressing our deep and sincere sorrow at your Excellency's somewhat premature departing from this country. We humbly hope that your Excellency will, after your return to yorr native land continue to take the same interest in the welfare of this conntry and of

the people of Barrackpore who have some claims upon your Excellency's kind consideration as you have done while ruling their destinies.

In conclusion we wish your Lordship and the Marchioness of Ripon a safe and pleasant journey home and pray that God may grant your long life and prosperity.

Sridhar Mandal }
Bansidhar Mandal } Presidents.

Nawabganj (Barrackpore)
The 6th December, 1884. Adaita Charan Mandal.
Hony. Secy.

বড়লাট এই বিদায় অভিনন্দনের উত্তরে বলেন :—

"বন্ধুগণ! এই পার্কে আজ আর একবার আপনাদের সাক্ষাৎ পাইয়া আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি; আপনারা আমাকে যে অভিনন্দন দিয়াছেন সেজন্য আপনাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা জানেন, আমি এদেশে আগমনাবধি বারাকপুরে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক বৎসর যখনই আমি এখানে আসিয়াছি, তখনই আমি এখানকার শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নবাবগঞ্জে যখন নূতন স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হয়; তখন অনেকের মনে ভয় হইয়াছিল যে, ইহার ফলে বারাকপুর স্কুলটীর উন্নতির ব্যাঘাত হইবে, কিন্তু বারাকপুরের ন্যায় বহু জনাকীর্ণ স্থানে দুইটী স্কুলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকায় কোন স্কুলের উন্নতির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নবাবগঞ্জ স্কুলটীর জন্য সাহায্য করা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে

করিয়াছিলাম। এই স্কুলটী শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল এই দুই মহানুভবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, সুখের বিষয় আজ তাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন। আজ যে দুইটী স্কুলেরই কর্তৃপক্ষ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আপনারা একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছেন; ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এই দৃষ্টান্ত পাইয়া আমি নবাবগঞ্জ স্কুলের জন্য এতটা যত্ন লইতাম। এদেশের লোকে সকল প্রকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, আমার কার্য্যকালে তাহার চেষ্টা করিয়াছি। নবাবগঞ্জ স্কুলটী যে এত উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং এই স্কুলটীর দ্বারা বারাকপুর স্কুলের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই জানিয়া আরও আনন্দিত হইয়াছি।

আপনারা জানিবেন, আমি বারাকপুরের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি ভারতে অবস্থানকালে যে কয়েকঘণ্টা এখানে কাটাইয়াছি তাহা অতি আনন্দের মধ্যে কাটাইয়াছি। এই সুন্দর পার্কের কথা চিরদিনই আমার স্মৃতি-পথে থাকিবে। আপনাদের নিকট এখন আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি এবং আমি বিশ্বাস করি ভগবান আপনাদের মঙ্গল সাধন করিবেন।

একটা কথা বলিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছি। গত বৎসর আমি বলিয়াছিলাম যে আগামী বৎসর আমি বারাকপুর স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ করিব, যদিও আমি আগামী ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ্চ মাসে এখানে থাকিব না, তথাচ আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।

এফ ডব্লিউ লাটিমার

৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪।

The following is His Excellency's reply to the address :—

"Gentlemen and you my young friends :—I am very glad indeed to meet you once more in the Park, and I thank you very sincerely for the address which you have presented to me. As you are well aware, I have, ever since I have been in this country, taken a great interest in the subject of education in Barrackpore and its neighbourhood, and I have done what I could to promote that important object each year that I have visited this place. When the new school was established at Nawabganj there was some fear on the part of those specially interested in the Barrackpore School lest its existence might interfere with their prosperity, but nevertheless, believing as I did, that in a large population such as that which exists in this district there was ample room for two schools, and in spite of the strong interest, which I took in the Barrackpore school, I thought it my duty to give all the assistance in my power to the Nawabganj school which has been established and supported by the signal munificence of the two gentlemen, whom I see present, Babu Sridhar Mandal and Babu Bansidhar Mandal. It is particularly gratifying to me under these circumstances to see these two schools gathered together here on this

occasion, and to have such a remarkable proof of the fact that you are working harmoniously together and that the only real rivalry existing between you is the rivalry as to which of you will do the most for the interest of the children under your care. I was led to feel a particularly deep interest in the school at Nawabganj because it furnished a notable example of what might be done by private efforts in the matter of education. It has been one of my endeavours during the period of viceroyalty to encourage self-help among the people of this country to the utmost of my power in various directions (applause). I believe there are few directions in which that great principle can be applied with greater advantage than with respect to public education, and it was therefore particularly pleasant to me to be able to give my countenance to a school established by private enterprise for the primary and also for the higher education of a rural district like this. That, that school has succeeded so well affords me great gratification, a gratification which is enhanced by the belief that its success has not interfered with the progress of the Barrackpore school, and that there is plenty of good works to be done by both of them.

I can assure you that I shall always feel a great interest in the welfare and prosperity of the people of Barrackpore and its neighbourhood. I have spent here some of the pleasentest hours that I have spent in India and I shall carry away with me the most agreeable recollections of this beautiful park, and in bidding you farewell, I most earnestly trust it will please God to bless you with every prosperity (applause).

There is one matter which I omitted to mention. I said last year that I would at the usual time give the prize next year to the Barrackpore school as I had given in previous years. It is quite true that I shall not be here next February or March but I have not the smallest intention of availing myself of that circumstances to get out of my promise and I shall be very happy to give the prize all the same. (applause).

Sd. F. W. Latimer.

9th December 1884.

মণ্ডল-ভ্রাতৃদ্বয় বদান্যতার বশবর্ত্তী হইয়া একটী গঙ্গাবাসীর গৃহ নির্ম্মাণ করেন। স্থানাভাবে যখন নবাবগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে ইছাপুরে স্থানান্তরিত করিবার উপক্রম করা হইতেছিল, তখন তাঁহারা চিকিৎসালয়টীর জন্য একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তারপর মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিং নির্ম্মিত হইলে ডাক্তারখানাটি তথায় স্থানান্তরিত করা হয়।

মহিলা স্নানার্থিনীদিগের স্নানের অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কলিকাতা মোহনটুনীতে একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বাবু শ্রীধর মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু চন্দ্রশেখর মণ্ডল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তিন পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রগণের নাম (১)হরিদাস (২) শ্রীনিবাস (৩) বিজয়কৃষ্ণ। ১৮৮৭খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই স্বনামধন্য বংশীধর মণ্ডল মহাশয় অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি একটী উইল করিয়া যান। সেই উইলে তিনি তাঁহার চারি ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহার এষ্টেটের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নাম—(১) অদ্বৈতচরণ (২) নিত্যানন্দ (৩) গৌরচন্দ্র (৪) গদাধর।

১২। শ্রীধর মণ্ডল ১৮৯৪ সালের ২০শে এপ্রিল চারি পুত্র এবং তিন প্রপৌত্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র চতুষ্টয়ের নাম (১) অদ্বৈতচরণ (২) নিত্যানন্দ (৩) গৌরচন্দ্র (৪) গদাধর এবং পৌত্রগণের নাম (১) হরিদাস (২) শ্রীনিবাস (৩) বিজয় কৃষ্ণ।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৺শ্রীধর মণ্ডলের স্ত্রী শ্রীমতী ত্রিপুরা সুন্দরী দাসী একদা চাঁপদানী উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া গঙ্গার গর্ভে জল লইতে আগতা নারীদের কষ্ট দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিচলিতা হন এবং পঙ্গতা



শ্রীযুত গদাধর মণ্ডল
জন্ম ১৬ই ভাদ্র ১২৭৭।

ফেরি ঘাটে একটি পাকা স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে তাঁহার ৫৭৫০৲ টাকা খরচ পড়ে। ইহাতে স্থানীয় নারীদের কষ্ট দূরীভূত হয়। ১৯০৪ সালের ২৪শে মার্চ্চ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীধর মণ্ডলের তৃতীয় পুত্র নিত্যানন্দ মণ্ডল ১৯০৪ সালের ২৪শে জুন তিন পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র তিনটীর নাম (১) ক্ষেত্র মোহন (২) বলদেব (৩) শুকদেব। ইহারাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

১৯০৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো সপত্নীক বাবু অদ্বৈত চরণ মণ্ডলের আমন্ত্রণে ৺গোপীনাথ জীউঠাকুর ঠাকুরাণীর মন্দির পরিদর্শন করেন। ১৯০৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়:—

"নবাবগঞ্জে লর্ড মিণ্টো"।

"লর্ড মিণ্টো, লেডী মিণ্টো, তাঁহাদের কন্যাগণ ও বড়লাটের পরিষদ-বর্গ মিলিটারী সেক্রেটারী ও এডিকং সমাভিব্যাহারে গত রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বাবু শ্রীধর ও বংশীধর মণ্ডলের ঠাকুরবাটী পরিদর্শন করেন। বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। বড়লাট বাহাদুর ও অন্যান্য সকলে এই মন্দির দর্শনে পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণনগরের মৃন্ময় মূর্ত্তি সকলের উপর বড়লাটের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অভ্যর্থনায় বড়লাট যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্থানীয় লোকেরা বড়লাটের এই পরিদর্শনের স্মৃতি চিরকাল মনে রাখিবে।"

LORD MINTO AT NAWABGANJ.

His Excellency the Viceroy, Lady Minto, and their daughters and a party accompanied by the Military Secretary and the A. D. C paid, by appointment, a visit to the Thakurbati of Babu Sridhar and Bansidhar Mandal, at Nawabganj, last sunday afternoon at 5. P. M. They were received by Babus Adaita Charan Mandal who had spared no pains to accord to their excellencies a right regal welcome. Lord Minto's charming manners and affability made an excellent impression upon the simple-minded country folk and their excellencies appeared to take much interest in the sacred edifice and all that they saw in it. The clay figures from Krishnagore specially attracted Viceregal attention. His Excellency seemed to be delighted with their reception and the memory of this visit of the 'Burra Lat' will ever remain green in this locality".

বড়লাটের পরিদর্শন স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা ঠাকুর বাটীতে লর্ডমিণ্টোর একটী মর্ম্মর প্রস্তর ফলক প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীধর মণ্ডল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৪ সালে বারাকপুর সরকারী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৬৯। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আইনের লেক্চার শেষ করেন। এই সময় তাঁহার পিতা বাবু শ্রীধর মণ্ডল ও খুল্লতাত বাবু বংশীধর মণ্ডল বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ায় ব্যবসায়কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে তিনি বাধ্য হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে মিঃ এ পেডলার বড়লাটের দরবারে উপস্থাপিত করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বারাকপুর কোর্টের তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি একাকী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। বারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল আর, এন্, ষ্টার্ণডেল তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :—

বারাকপুর ম্যাজিষ্ট্রেসি
১৪ই নভেম্বর, ১৮৯০।

বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল

প্রিয় মহাশয়,

১২ই তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ সংখ্যায় বারাকপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটপদে আপনাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এই সংবাদ আছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট আমি আপনার নাম অতি আনন্দের সহিত প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
আর, এন্, ষ্টার্ণডেল
ম্যাজিষ্ট্রেট—বারাকপুর।

To Babu Adwaita Charan Mandal.
My dear Sir,

I have much satisfaction in drawing your attention to the Calcutta Gazette of the 12th inst. in which your appointment as an Honorary Magistrate of the Barrackpore Inde-

pendent Bench appears. It gave me great pleasure to submit your name to Government.

Yours truly

Sd. R. N. Sterndale.

Magte, Barrackpore.

১৯০১ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি একাকী সেই সমস্ত মকদ্দমার বিচার করিবার ভার প্রাপ্ত হন, যাহা বারাসতের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিতেন।

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

১৯০৮ সালের জুন মাসে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন এবং বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে যে সমস্ত মামলার বিচার স্বাধীনভাব করিতে দেন, তাহার বিচারভার প্রাপ্ত হন।

১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সেই সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি এইরূপ:—

"সপারিষদ্ বড়লাটের আদেশে মহামান্য সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের নামে শ্রীধর মণ্ডলের পুত্র বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডলকে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে ভাল কার্য্য করিবার জন্য এই সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইতেছে।"

জে এন্ বোর্ডলিয়ন

জানুয়ারী ১লা ১৯০৩। বাঙ্গালার ছোটলাট।

CERTIFICATE OF HONOUR.

"By command of His Excellency the Viceroy and Governor General in Council this certificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty, King Edward VII Emperor of India to Babu Adwaita Charan Mandal son of Babu Sridhar Mandal in recognition of his good services as an Hony. Magte. and a Municipal Commissioner."

January 1st 1903. Sd. J. N. Bourdlion.
Lieutenant-Governor of Bengal.

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিম্নলিখিত সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন :—

"সপরিষদ বড়লাটের অনুমত্যানুসারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নামে সম্রাটের দিল্লী রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বাবু শ্রীধর মণ্ডলের পুত্র বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডলকে তাঁহার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটী ও সাধারণ-হিতকর কার্য্যের জন্য এই সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইতেছে।

এফ· ডব্লিউ· ডিউক
১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ বাঙ্গালার লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর

CERTIFICATE OF HONOUR.

"By command of His Excellency the Viceroy and Governor-General in Council, this certificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty, King George V Emperor of India, on the occasion of His Majesty's Coronation Durbar at Delhi, to Babu Adwaita Charan

Mandal, son of Babu Sridhar Mandal in recognition of his services as an Honorary Magistrate and public spirit."

Dated 12th December 1911. } (Sd) F. W. Duke.
Lieutenant Governor of
Bengal

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি দিল্লী দরবারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ সালের ২রা জানুয়ারী সম্রাট এবং মহিষীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কলিকাতা লাট-প্রাসাদে সান্ধ্য-উৎসবে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং ছোটলাট তাঁহাকে সম্রাটের লেভিতে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনাবধি বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল উত্তর বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচিত কমিশনার-পদে তাঁহার কার্য্যক্ষম বয়সাবধি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯২১ সালের ৪ঠা জুন অদ্বৈতবাবুকে বঙ্গের লাট বাহাদুর দার্জ্জিলিং হইতে রায় বাহাদুর উপাধির সনন্দ দরবারে দিবার পূর্ব্বে একখানি টেলিগ্রাম করেন। সেই টেলিগ্রামের প্রতিলিপি এইরূপ :—

দার্জ্জিলিং
৪ঠা জুন ১৯২১ সাল।

রায় অদ্বৈতচরণ মণ্ডল বাহাদুর
অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট
ইছাপুর, নবাবগঞ্জ

মহামান্য বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে আমি আপনাকে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রেরণ করিতেছি।

গভর্ণর বাহাদুরের নিজস্ব সেক্রেটারী।

TELEGRAM.

The 4th day of June 1921.

DARJEELING.

RAI ADWAITA CHARAN MANDAL BAHADUR,

Honorary Magistrate, Ichapore, Nawabganj.

Am directed by his Excellency to convey to you his hearty congratulations.

P. S. G.

অদ্বৈতবাবুও তাঁহার প্রত্যুত্তরে গভর্ণর বাহাদুরকে তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯২১ সালের ১৬ই নভেম্বর বঙ্গের তদানীন্তন গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা লাট-ভবনে দরবারে অদ্বৈতবাবুকে "রায় বাহাদুর" সনদ প্রদান করেন। সেই সনদের প্রতিলিপি এইরূপ :—

সনদ

বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল

নবাবগঞ্জ

বেঙ্গল

আমি এতদ্দ্বারা আপনাকে আপনার স্বীয় কৃতিত্বের জন্য "রায় বাহাদুর" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতেছি।

সিমলা (স্বাঃ) রিডিং

৪ঠা জুন ১৯২১। ভারতের সপারিষদ্ রাজপ্রতিনিধি এবং

বড়লাট বাহাদুর।

SANAD

To

Babu Adwaita Charan Mandal,

of Nawabganj, Bengal.

I hereby confer upon you the title of Rai Bahadur as a personal distinction.

Simla, The 4th June 1921.	(Sd) Reading Viceroy and Governor General of India.

দরবারে লাটবাহাদুর সনন্দ-প্রদান-কালে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

"আমি আপনাকে "রায়বাহাদুর" খেতাবের সনন্দ প্রদান করিতে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। রায় অদ্বৈতচরণ মণ্ডল বাহাদুর, আপনি শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউর ঠাকুর বাটীর প্রধান সেবায়েৎ পদে আসীন থাকিয়া গুরুদায়িত্ব সম্পাদনে চরম যশ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং আপনি এবং আপনার বংশের প্রতি, সর্ব্বসাধারণ, প্রয়োজনীয় দাতব্য সম্প্রদায় সমূহ প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখিবার কারণ, সাধারণের উপকারার্থে অতি অভাবনীয় কার্য্যাবলী সম্পাদন কারণ, প্রকৃতপক্ষে ঋণী। এতদ্‌সত্বেও আপনি ৩০ ত্রিশ বৎসর যাবৎ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে আপনার সময় স্বচ্ছন্দ-চিত্তে নিয়োগ করিয়াছেন।"

In Conferring the titles at Durbar His Excellency Lord Ronaldsay said :—

"RAI ADWAITA CHARAN MANDAL BAHADUR,

You have taken a high view of the responsibilities which devolve upon you as Head Shebait of the Iswar Gopiji Thakur-bati, and to you and your family the public owe the upkeep of greatly appreciated charitable institution and the construction of much needed works of public utility. You have in addition given freely of your time to the public during the last 30 years in the capacity of an Honorary Magistrate and as a Municipal Commissioner."

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি মণ্ডল বংশের উজ্জ্বলরত্ন রায় অদ্বৈতচরণ মণ্ডল বাহাদুর মহাশয় তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং পরিবারবর্গকে বিষাদ-সাগরে ভাসাইয়া ৭৯ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

৺শ্রীধর মণ্ডলের চতুর্থ পুত্র বাবু গৌরচন্দ্র মণ্ডল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নবাবগঞ্জের শ্রীধর বংশীধর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তিনি গারুলিয়ার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ৬ বৎসর যাবৎ তিনি বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটীর গভর্ণমেণ্ট-মনোনীত কমিশনার ছিলেন এবং পরে সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বড়লাটের লেভীতে এবং ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

অদ্বৈতবাবুর বার্দ্ধক্যকালে যখন তিনি কার্য্যে অক্ষম হইলেন তখন হইতে ৺গোপীনাথ জীউ ঠাকুর-বাটীর প্রধান সেবায়েৎ-পদে এবং "শ্রীধর বংশীধর" স্কুলের সেক্রেটারী-পদে গৌরবাবু আসীন হইলেন।

গৌরচন্দ্র মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নরনারায়ণ মণ্ডল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবাবগঞ্জ ব্রজমোহন বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ পূর্ব্বক শ্রীধর বংশীধর স্কুল হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কিছুকাল হোমিওপ্যাথিক কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি এক্ষণে তাঁহার পিতার এষ্টেট ও ব্যবসাদি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান অরবিন্দ মণ্ডল এক্ষণে পিতা ও পিতামহের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহনারায়ণ, গৌরবাবুর মধ্যম পুত্র। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রজমোহন বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া এক্ষণে তিনি শ্রীধর বংশীধর স্কুলে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন।

২৪। ৺শ্রীধর মণ্ডলের কনিষ্ঠপুত্র গদাধর মণ্ডল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পানিবসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বাটীতে পাঠ আরম্ভ করেন এবং সাহিত্য ও ব্যবসায়বিষয়ক এরূপ জ্ঞান লাভ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের মধ্যে কদাচিৎ সেরূপ জ্ঞান দেখা যায়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের মেম্বর মাননীয় মিঃ ডব্লিউ এইচ গ্রিম্‌লে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট হাউস লেভীতে উপস্থিত করেন। ইহার দশ বৎসর পরে সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিটির সভ্য নিযুক্ত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পল্লীবাসীদের দুর্দ্দশা-দর্শনে নবাবগঞ্জে একটি সমবায় ঋণদান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাঙ্কের সভ্যেরা তাঁহাকে ব্যাঙ্ক কমিটির

সম্পাদক নির্ব্বাচিত করেন। ঐ বৎসরেই খিতাড়ায় তাঁহার জমিদারীর রায়তেরা তাঁহার নানা সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উত্তর বারাকপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। তাঁহারা দ্বিতীয় বারও তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করেন। জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি বারাসাত হইতে নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তায় দুইটী পাকা পুল নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বারাকপুর কোর্টের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। উড়িয়া পাড়া ও খিতাড়ার অধিবাসীদের স্নানের অসুবিধা দর্শনে তিনি উড়িয়া পাড়ার গঙ্গাতীরে একটী পাকা স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৯১৬ সালের নভেম্বর পর্য্যন্ত তিনি নর্থ বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুনরায় ১৯২১ সালের অক্টোবর হইতে ঐ পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মণ্ডলের তিন পুত্র। হরিদাস, শ্রীনিবাস ও বিজয়কৃষ্ণ। তাঁহারা যথাক্রমে ১৮৬৮, ১৮৭৩, এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হরিদাস ও শ্রীনিবাস শ্রীধরবংশীধর স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বাবু বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাফ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এফ্-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাঁহারা এখন আপন এষ্টেট পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীনিবাস মণ্ডলের দুই পুত্র শ্রীমান রূপদাস ও রামদাস যথাক্রমে ১৯০৬ এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রূপদাস শ্রীধরবংশীধর স্কুলে এণ্ট্রান্স অবধি পাঠাভ্যাস করেন। পরে কিছুকাল হোমিওপ্যাথিক কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উপস্থিত তিনি নিজ ব্যবসাদি পরিচালনা করিতেছেন এবং রামদাস উক্ত স্কুলে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডলের পুত্র শ্রীমান্ মদনমোহন মণ্ডল ১৯০৮

খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীধরবংশীধর স্কুলে পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক নিজ ব্যবসাদি ও এষ্টেট পরিচালনা করিতেছেন।

বাবু ক্ষেত্রমোহন, বলদেব, শুকদেব এবং বাসুদেব স্বর্গীয় বাবু নিত্যানন্দ মণ্ডলের পুত্র। ইঁহারা সকলেই শ্রীধরবংশীধর স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বাসুদেব ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অল্প বয়সে কালের করালকবলে নিপতিত হয়েন। ক্ষেত্রমোহন বাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্‌ এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাঁহারা এখন নিজ এষ্টেট পরিচালনা করিতেছেন। বলদেব ও শুকদেব যথাক্রমে ১৮৮৩ এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উপস্থিত নিজ এষ্টেট পরিচালনা করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন মণ্ডলের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সদানন্দ মণ্ডল ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক্ষণে শ্রীধরবংশীধর স্কুলে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান পরমানন্দ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং উপস্থিত ব্রজমোহন বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছেন।

শ্রীমান্ বলদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলকুমার ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও উক্ত স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতেছেন।

বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু ক্ষেত্রদাস মণ্ডল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও শ্রীধরবংশীধর স্কুলে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনারেবল স্যার চার্লস্ এলেন তাঁহাকে বড়লাটের দরবারে উপস্থিত করেন। তিনি এখন পিতার জমিদারী আদি পরিচালনা করিতেছেন।

বাবু কালীচরণ মণ্ডল, গোপীজীবন মণ্ডল এবং কানাই লাল মণ্ডল যথাক্রমে ১৮৭৩, ১৮৭৫ এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডলের মধ্যম, তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র।



স্বর্গীয় কালিচরণ মণ্ডল।

জন্ম ১৩ই মে ১৮৭৩ মৃত্যু ২০শে মার্চ্চ ১৯১০।



শ্রীযুত গোষ্ঠ বিহারী মণ্ডল।

তাঁহারা শ্রীধরবংশীধর স্কুলে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া এখন পিতৃ-জমীদারী ও ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন। মধ্যম পুত্র কালীচরণ মণ্ডল ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ২০ মার্চ্চ তারিখে স্বর্গারোহণ করেন।

বাবু হরিদাস মণ্ডলের পাঁচ পুত্র শ্রীমান্ হৃষীকেশ, গোরাচাঁদ সনাতন, রঘুনাথ ও নরোত্তম যথাক্রমে ১৮৯০, ১৯০০, ১৯০৬, ১৯০৯ এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মাতুল মানকুণ্ডু-নিবাসী ৺বলদেব খাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হৃষীকেশ এবং মধ্যম পুত্র গোরাচাঁদ মণ্ডল উভয়েই এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

স্বর্গীয় কালীচরণ মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রায় অদ্বৈতচরণ মণ্ডল বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র। তিনি শ্রীধরবংশীধর বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকিউলেসন পাশ করিয়া স্কটিশচার্চ্চ কলেজে আই-এ অধ্যয়ন করেন। তিনি এক্ষণে তাঁহাদের জমিদারী ও ব্যবসাদি পরিচালনা করিতেছেন। বঙ্গের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের গভর্ণমেণ্ট হাউস লেভিতে উপস্থিত করেন।

স্বর্গীয় বাবু কালীচরণ মণ্ডলের দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বৃন্দাবনবিহারী এবং ব্রজবিহারী মণ্ডল যথাক্রমে ১৯০০ এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনবিহারী শ্রীধরবংশীধর স্কুলে পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক তাঁহাদের ব্যবসাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীমান ব্রজবিহারী শ্রীধরবংশীধর স্কুল হইতে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যা-সাগর কলেজে আই এস সি অধ্যয়ন করেন। তিনি এক্ষণে নিজ ব্যবসাদি পরিচালনা করিতেছেন।

৩৩। শ্রীগোপীজীবন মণ্ডলের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুধাকর মণ্ডল

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজমোহন বঙ্গবিদ্যালয়ে তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীধরবংশীধর স্কুল হইতে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে আই এস সি অধ্যয়ন করেন। তিনি এক্ষণে তাঁহাদিগের এষ্টেট পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীমান্ কানাই-লাল মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পরেশচন্দ্র মণ্ডল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপস্থিত শ্রীধরবংশীধর স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতেছেন।

বাবু গদাধর মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীধরবংশীধর স্কুল হইতে ম্যাট্রিকিউলেসন পাশ করিয়া স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে আই এ অধ্যয়ন করেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯২৬ সালে তাঁহার পুত্র সরোজকুমার ও কন্যা-গণকে অতল জলে ভাসাইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হন।

বাবু হরেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল শ্রীযুক্ত গদাধর মণ্ডলের দ্বিতীয় পুত্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীধরবংশীধর স্কুল হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকিউলেসন পাশ করেন এবং স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাজুয়েট হন। ইনি এক্ষণে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীযুক্ত গদাধর মণ্ডলের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান তপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীধরবংশীধর স্কুল হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকিউলেসন পাশ করিয়া স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে আই এস সি অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গদাধর মণ্ডলের ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ রমেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীধরবংশীধর স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারী মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাসবিহারী মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি



শ্রীমান রাসবিহারী মণ্ডল।

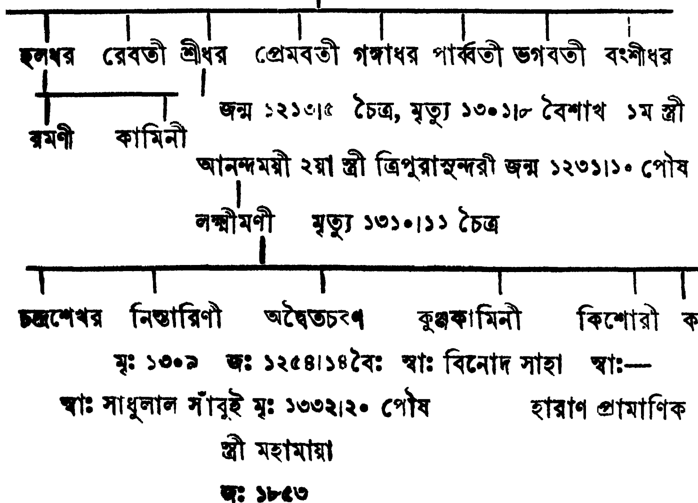
উত্তরাধিকারীসূত্রে হুগলী জেলার অন্তর্গত মানকুণ্ডনিবাসী ৺কানাইলাল খাঁয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শ্যামদাস খাঁ মাতুল মহাশয়ের প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। তিনি উপস্থিত ব্রজমোহন বঙ্গবিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বংশমর্য্যাদায় এই মণ্ডল পরিবার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে চলিয়াছেন।

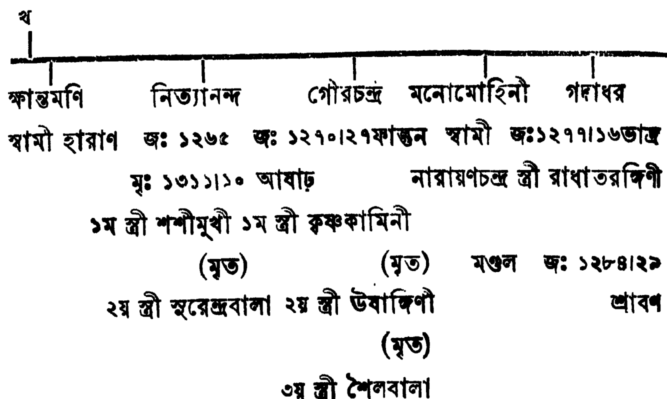
নবাবগঞ্জ মণ্ডল-পরিবারের বংশলতা।

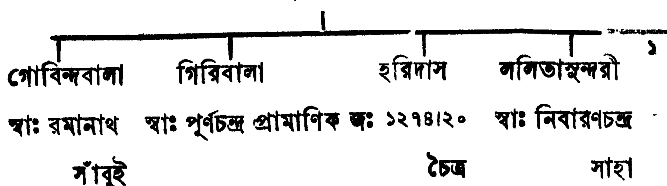


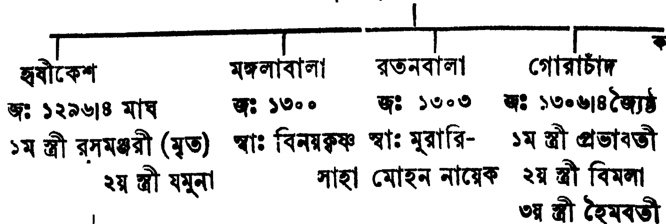
জাতি বৈশ্য সাহা ; গোত্র কৌশিকী।

বাঞ্ছারাম মণ্ডল
|
পঞ্চানন্দ মণ্ডল
স্ত্রী সোহাগিনী
|
রামগোপাল মণ্ডল
স্ত্রী যতনমণি
|
রসময় মণ্ডল
স্ত্রী রাসমণি




খ
ক্ষান্তমণি
স্বামী হারাণ
নিত্যানন্দ
জঃ ১২৬৫
মৃঃ ১৩১১।১০ আষাঢ়
১ম স্ত্রী শশীমুখী (মৃত)
২য় স্ত্রী সুরেন্দ্রবালা
গৌরচন্দ্র
জঃ ১২৭০।২৭ফাল্গুন
১ম স্ত্রী কৃষ্ণকামিনী (মৃত)
২য় স্ত্রী উষাঙ্গিণী (মৃত)
৩য় স্ত্রী শৈলবালা
মনোমোহিনী
স্বামী নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল
গদাধর
জঃ১২৭৭।১৬ভাদ্র
স্ত্রী রাধাতরঙ্গিণী
জঃ ১২৮৪।২৯ শ্রাবণ


চন্দ্রশেখর মণ্ডল
মৃত্যু ১২৯২।১৩ মাঘ
স্ত্রী উত্তমমণি
১
গোবিন্দবালা
স্বাঃ রমানাথ সাঁবুই
গিরিবালা
স্বাঃ পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক
হরিদাস
জঃ ১২৭৪।২০ চৈত্র
স্ত্রী গৌরমণি
জঃ ১২৮১।৯ কার্ত্তিক
ললিতাসুন্দরী
স্বাঃ নিবারণচন্দ্র সাহা


হৃষীকেশ
জঃ ১২৯৬।৪ মাঘ
১ম স্ত্রী রসমঞ্জরী (মৃত)
২য় স্ত্রী যমুনা
মঙ্গলাবালা
জঃ ১৩০০
স্বাঃ বিনয়কৃষ্ণ সাহা
রতনবালা
জঃ ১৩০৩
স্বাঃ মুরারি-মোহন নায়েক
গোরাচাঁদ
জঃ ১৩০৬।৪জ্যৈষ্ঠ
১ম স্ত্রী প্রভাবতী
২য় স্ত্রী বিমলা
৩য় স্ত্রী হৈমবতী
ক

১ম স্ত্রী রসমঞ্জরী (মৃত)

নারায়ণ
জঃ ১৩১৮।২০
অগ্রহায়ণ

মধুসূদন
জঃ ১৩২২।৯ অগ্রহায়ণ

বিনাপাণি
জঃ ১৩২৪

খ

সনাতন
জঃ ১৩১৩।৩ জ্যৈষ্ঠ
স্ত্রী চামেলী
জঃ ১৩২৪।২ শ্রাবণ

রঘুনাথ
জঃ ১৩১৬।২০ পৌষ
স্ত্রী মঙ্গলা
জঃ ১৩২৩।২৭ কার্তিক

নরোত্তম
জঃ ১৩১৮

২

শ্রীনিবাস
জঃ ১২৭৯
১ম স্ত্রী শৈলবালা (মৃত)
২য় স্ত্রী অনিলা

দেবরাণী
স্বাঃ রমানাথ সাঁবুই

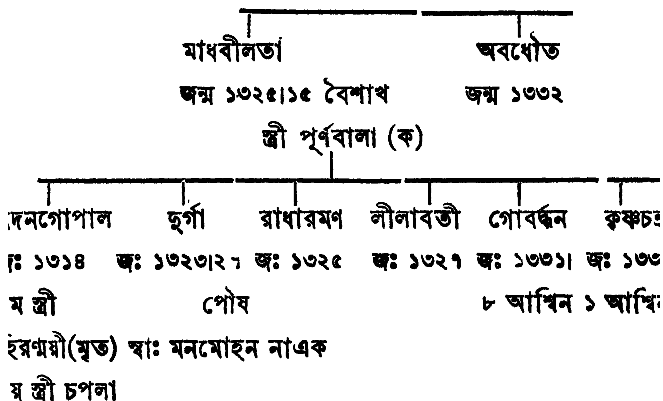
জঃ ১২৮৭।২৪ আশ্বিন
স্ত্রী পূর্ণবালা (ক)

বৃন্দাবনবালা
জঃ ১৩১০
স্বাঃ বীরেন্দ্র মণ্ডল

রূপদাস
জঃ ১৩১২
১ম স্ত্রী আশালতা (মৃত)
২য় স্ত্রী শিবসুন্দরী
অসীমবালা জন্ম ১৩৩৪।১৫ আষাঢ়

বিষ্ণুপ্রিয়া
জঃ ১৩১৫
স্বাঃ নন্দলাল হাজরা

রামদাস
জঃ ১৩১৮।১১ মাঘ



অদ্বৈতচরণ মণ্ডল
জঃ ১২৫৪।১৪ বৈশাখ
মৃঃ ১৩৩২।২০ পৌষ
স্ত্রী মহামায়া জঃ ১২৫৯

ক্ষেত্রদাস
জঃ ১২৭৭।১৩মাঘ
১ম স্ত্রী নারায়ণী (মৃত)
২য় স্ত্রী সত্যভূষণ
জঃ ১২৯৩।১২ ফাল্গুণ
| খ

কালিচরণ
জঃ ১২৮০।১জ্যৈষ্ঠ
মৃঃ ১৩১৬।৬ চৈত্র
স্ত্রী সুরেন্দ্রবালা
জঃ ১২৮১।

গোপিজীবন
জঃ ১২৮১।৩০ মাঘ
স্ত্রী নলিনীবালা
জঃ ১২৮৯।২৮ বৈশাখ
সুধাকর
জঃ ১৩০৮।৯ পৌষ
স্ত্রী অন্নপূর্ণা
জঃ ১৩১৭।২৭ অগ্রহায়ণ
| ক

কানাইলাল
জঃ ১২৮৯।২ভাদ্র
স্ত্রী গৌরমণি
জঃ ১২৯৯।১৪ পৌষ
পরেশচন্দ্র
জঃ ১৩১৬।৬ চৈত্র
স্ত্রী সরস্বতী

ক

নবকুমারী — জঃ ১৩৩২।১৭ আশ্বিন
রাইকিশোরী — জঃ ১৩৩৩।১২ পৌষ
কুসুমকুমারী — জঃ ১৩৩৫।২৬ আশ্বিন

খ

গোষ্ঠবিহারী — জঃ ১৩০২। ৩০ আশ্বিন — স্ত্রী নিরূপমা জঃ ১৩১০।১৮ আশ্বিন
রাজনন্দিনী — জঃ ১৩০৪ — স্বাঃ শরৎচন্দ্র মণ্ডল
বৃন্দাবনবিহারী — জঃ ১৩০৬।৩০ চৈত্র — স্ত্রী নরেশনন্দিনী জঃ ১৩১৫।২৫ জ্যৈষ্ঠ
ব্রজবিহারী — জঃ ১৩১০।৩১ বৈশাখ — স্ত্রী স্বর্ণলতা জঃ ১৩২০।৩২ আষাঢ়
শকুন্তলা — জঃ ১৩১৫ — স্বাঃ রাজকৃষ্ণ সাহা

রাসবিহারী — জঃ ১৩২৬।২৩ কার্ত্তিক
বঙ্কুবিহারী — জঃ ১৩৩১।২৭ কার্ত্তিক
নিকুঞ্জবিহারী — জঃ ১৩৩২।৮ জ্যৈষ্ঠ

নিত্যানন্দ মণ্ডল

জন্ম ১২৬৫

মৃত্যু ১৩১১।১০ আষাঢ়

১ম স্ত্রী শশীমুখী (মৃত)

২য় স্ত্রী সুরেন্দ্রবালা



ক্ষেত্রমোহন বলদেব শুকদেব বাসুদেব

ক্ষেত্রমোহন — জঃ ১২৮৭।৬মাঘ — ১ম স্ত্রী হরিদাসী (মৃত) — ২য় স্ত্রী চরণদাসী*

বলদেব — জঃ ১২৮৯।৬কার্ত্তিক — স্ত্রী প্রভাবতী

শুকদেব — জঃ ১২৯২।২৯ আষাঢ় — ১ম স্ত্রী সরযূবালা (মৃত) — ২য় স্ত্রী সরজিনী ✝

বাসুদেব — জঃ ১২৯৪ — মৃত্যু ১৩০৮

শ্বেতাজিনী — জঃ ১৩১৬।১৭ মাঘ — স্বাঃ অরুণচন্দ্র সাহা

অনীলকুমার — জঃ ১৩১৮।৮ ফাল্গুন

সুশীলকুমার — জঃ ১৩২১। ১৫ শ্রাবণ

পঙ্কজিনী — জঃ ১৩২৪। ১ ভাদ্র

গুইরাম — জঃ ১৩৩২। আশ্বিন

২য় স্ত্রী চরণদাসী*

সদানন্দ — জঃ ১৩১৩৭।১২ জ্যৈষ্ঠ — স্ত্রী কাত্যায়নী

ভক্তিলীলা — জঃ ১৩১৮।২৯ পৌষ — স্বাঃ পাঁচুগোপাল সাঁবুই

পরমানন্দ — জঃ ১৩২৫।৪ পৌষ

২য় স্ত্রী সরজিনী ✝

বরদাকান্ত — জঃ ১৩২০ ভাদ্র

রজনীকান্ত — জঃ ১৩২২। ১৭ আষাঢ়

পারুলবালা — জঃ ১৩২৫। আশ্বিন

নীলকান্ত — ১৩২৭। (মৃত)

তরণীবালা — জঃ ১৩৩০।১০ কার্ত্তিক

গৌরচন্দ্র মণ্ডল তিন স্ত্রী
জঃ ১৮৬৪।৯ মার্চ্চ
১ম স্ত্রী কৃষ্ণকামিনী (মৃত)

এনাবালা	ক্ষেত্রমণি	বনবিহারী
জঃ ১২৯৩।২৬ অগ্রহায়ণ	জঃ ১২৯৫।১১ মাঘ	(মৃত)
স্বাঃ অমৃতলাল মণ্ডল	মৃঃ ১৩৩৩।১ কার্ত্তিক	
	স্বাঃ মণিলাল মল্লিক	

২য় স্ত্রী উষাঙ্গিণী (মৃত)

সরলাবালা	নরনারায়ণ
জঃ ১৩০৭।১০ মাঘ	জঃ ১৩১০।১১ কার্ত্তিক
স্বাঃ নিরানন্দ সাহা	স্ত্রী অনিলপ্রভা

কমলিনী	মৃণালিনী	অরবিন্দকুমার	তুলসীবালা	রবিন্দ্রকুমার
জঃ ১৩২৬। ১৮ পৌষ	জঃ ১৩২৯। ৩০ ভাদ্র	জঃ ১৩৩১।২৪ বৈশাখ	জঃ ১৩৩৩।১৪ জ্যৈষ্ঠ	জঃ ১৩৩৫।১৮ অগ্রহায়ণ

৩য় স্ত্রী শৈলবালা

সরসিপ্রভা	নৃসিংহনারায়ণ	বিনাপানী
জঃ ১৩১৭।৯ ভাদ্র	জঃ ১৩১৯।৩০ আষাঢ়	জঃ ১৩২০।২৫ আশ্বিন
স্বাঃ বলদেব মণ্ডল		স্বাঃ সত্যচরণ সাঁবুই
	সুবোধকুমার	বিদ্যুৎকুমার

জঃ ১৩২৪।৮ জ্যৈষ্ঠ জঃ ১৩২৬।১২ বৈশাখ জঃ ১৩২৭।২২ চৈত্র

মৃঃ ১৩৩৩।১৬ কার্ত্তিক

গোবিন্দলাল
জঃ ১৩২৯।৭ ফাল্গুন

মুকুন্দ
জঃ ১৩৩১।১৪ কার্ত্তিক

বিভাবতী
জঃ ১৩৩৪।২২ বৈশাখ

গদাধর মণ্ডল
জন্ম ১২৭৭।১৬ ভাদ্র
স্ত্রী রাধাতরঙ্গিনী
জন্ম ১২৮৪।২৯ শ্রাবণ

বসন্তলতা
জঃ ১২৯৭।৮ শ্রাবণ
স্বাঃ বনবিহারী মণ্ডল

কণকলতা
জঃ ১৩০১।১১ ভাদ্র
স্বাঃ জহরলাল খাঁ

নরেন্দ্রকৃষ্ণ
জঃ ১৩০৩।২১ আশ্বিন
মৃঃ ১৩৩৩।২৯ অগ্রহায়ণ
স্ত্রীঃ কনকলতা

সরোজকুমার
জঃ ১৩২৬।২৯ ভাদ্র

রঞ্জাবতী
জঃ ১৩২৮।২৩ ভাদ্র

পদ্মাবতী
জঃ ১৩৩১।৩ শ্রাবণ

চামেলীবালা
জঃ ১৩০৫।২৮ আষাঢ়
স্বাঃ স্থরেন্দ্রনাথ সাঁবুই

সুধাংশুবালা
জঃ ১৩০৮।২৬ ফাল্গুন
স্বাঃ হরেন্দ্রকুমার সাহা

হরেন্দ্রকৃষ্ণ—
জঃ ১৩১০।২৭ চৈত্র
স্ত্রীঃ সর্ব্বমঙ্গলা

জঃ ১৩১৭।২৯ আষাঢ়

অসিৎকুমার

জঃ ১৩৩৩।২৮ ফাল্গুন

তপেন্দ্রকৃষ্ণ	রমেন্দ্রকৃষ্ণ	মালতীবালা
জঃ ১৩১৫।৩ ভাদ্র	জঃ ১৩২৩।৩০ আশ্বিন	জঃ ১৩২৭।৩১ আশ্বিন



গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime,
And departing leave behind us
Foot-prints on the sands of time."

—Longfellow.

৺গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। মদনমোহন ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর। ষষ্ঠীদাস আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণের বংশধর।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার গোতিথা (গুস্তিয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশ মধ্যবিত্ত হইলেও অতি সম্ভ্রান্ত ছিল। বারাসত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপর তিনি কলিকাতার তৎকালীন হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। মহামতি ডেভিড হেয়ার ও কাপ্তেন রিচার্ডসন-প্রমুখ ইংরেজ মনীষিগণের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার চরিত্র অতি উন্নতভাবে গঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার ভাবী জীবনের কর্ম্মপথ সুপরিষ্কৃত হইয়াছিল। তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য বারাসত হাই স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পিতা শেষ জীবনে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগর নামক গ্রামে বাসস্থান স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক-পদ

গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি জেলা জজ কোর্টের অনুবাদক হন এবং ঘরে পড়িয়া প্রথম বিভাগে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গুণানুসারে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে বৎসর গোবিন্দচন্দ্র আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, সে বৎসর ৩ শত পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র তিনজন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন কিন্তু পূর্ণিয়া জিলাতেই ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, উৎসাহ, উদ্যম, স্বাধীন চেষ্টা ও আদর্শ চরিত্রপ্রভাবে তিনি অল্পদিনের মধ্যে পূর্ণিয়া 'বারে'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হন; সরকারী, বে-সরকারী, ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি করিতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, ব্যারিষ্টার, এমন কি বিচারপতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। যদি তিনি প্রথম হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন, তাহা হইলে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইতে পারিতেন, একথা বলাই বাহুল্য। বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন তখন গুরুদাসবাবু প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি যদিও শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন, তথাচ সভা-সমিতিতে মতদ্বৈধ হইলে তিনি সকলের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন। কি সরকারী, কি বে-সরকারী সকল লোকেই তাঁহার কথা স্থিরভাবে শুনিয়া অবশেষে তাঁহার মন্তব্যই গ্রহণ করিতেন। তিনি পোষাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন এবং দয়ালুতা ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার দ্বার সর্ব্বদাই অতিথি-অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। কখনও কোন অতিথি-অভ্যাগত আপনা হইতে চলিয়া না গেলে

তিনি কাহাকেও চলিয়া যাইতে বলিতেন না। দরিদ্রের তিনি প্রকৃত বান্ধব ছিলেন এবং দরিদ্রদিগকে তিনি দুঃসময়ে সাহায্য করিতেন। দরিদ্রেরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। যদি তাঁহার কর্ণে এই সংবাদ একবার আসিত যে, কোন লোক অর্থাভাবে চিকিৎসিত হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট নিজ ব্যয়ে ডাক্তার লইয়া যাইতেন এবং আসিবার সময় রোগী ও তাহার আত্মীয়স্বজনের অগোচরে রোগীর বালিশের নীচে কিছু টাকা রাখিয়া চলিয়া আসিতেন। সেই টাকা যখন রোগীর হাতে পড়িত, তখন তাহার বুঝিতে বাকি থাকিত না যে, ইহা মহানুভব গোবিন্দ-বাবুরই কাজ। ভাগলপুর, মুঙ্গের, মালদহ প্রভৃতি জেলায়ও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

'বারে'র নবীন উকিলদিগকে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি নবীন উকিলদের জন্য নিজে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতেন; বড় বড় মোকদ্দমায় তিনি নবীন উকিলদিগকে সঙ্গে লইতেন; মক্কেলদের তাঁহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকায় তিনি মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু টাকাকড়ি যাহা পাওয়া যাইত, তাহা জুনিয়র উকিলদিগকে দিতেন। নিজের প্রাপ্য টাকা এইভাবে সংসারে পরকে কে দিয়া থাকে? দরিদ্র মক্কেলদের নিকট হইতে টাকা লওয়া ত দূরের কথা, তিনি তাহাদিগকে বরং অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। মিথ্যা মোকদ্দমা তিনি কখনই গ্রহণ করিতেন না। সরকারী চাকুরী-স্বীকারও তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহাকে স্থায়ীভাবে সরকারী উকিল করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং একজন নবীন (Junior) উকিলকে তাহা দিতে বলেন। বলা বাহুল্য, নবীন উকিলকেই এই সরকারী ওকালতী দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহার অতিশয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল। সরলভাবে জীবনযাপন অথচ উচ্চ চিন্তা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বালকের ন্যায় তাঁহার সরলতা ছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা এত সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক ছিল যে, যে কেহ একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। যে কেহ অভাবের সময় তাঁহার নিকট প্রতীকার-প্রার্থনায় আসিত, তাহাকেই তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিতেন; কখনও কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। ছোট ছোট বালককে পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত ডাকিতেন। জীবনে তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুরাতন রোডসেস্ কমিটির সদস্য ছিলেন। পরে তিনি পূর্ণিয়া জেলা-বোর্ডের সদস্য হন। বহু দিন যাবৎ তিনি লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি মিউনিসিপাল কমিশনার ও জেলা-স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। যখন তিনি এইসমস্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন মিউনিসি-প্যালিটী তাঁহার সম্মানের জন্য যে রাস্তার উপর তাঁহার বাড়ী ছিল সেই রাস্তাটির নাম তাঁহার নামানুসারে রাখেন।

সরকারের নিকট তিনি কখনও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হন নাই। পূর্ণিয়া—বানেলীর রাজা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। অথচ তিনি কখনও রাজার নিকট নিজের জন্য কিছু যাচ্ঞা করেন নাই। তিনি কখনও জনসাধারণে নাম প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, নীরবে শান্তিময় জীবন-যাপনই তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। একবার তিনি কোন সূত্রে জানিতে পারেন যে, পূর্ণিয়া জেলার কলেক্টর সাহেব তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি কলেক্টর-মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে এই সম্মান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য বলেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্

অগত্যা তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন যে, গোবিন্দ বাবু কোন উপাধি লইতে ইচ্ছুক নহেন।

তাঁহার যথেষ্ট আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল; কিন্তু তিনি তোষামোদ ও অযথা প্রশংসাকে বড় ঘৃণা করিতেন। তিনি কোন দিন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়ান জেলা-জজ ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার বাটীতে সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। তিনি প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত।

অর্থের জন্য তাঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না। মামলা-মোকদ্দমা করিয়া বৃথা টাকা-কড়ির অপব্যয় করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। বিহার—বনেলী-রাজের তিনি আইনের পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বনেলী রাজ্যের বিভাগ-করণের মামলা উপস্থিত হইলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাহা তাঁহারই চেষ্টা ও প্রযত্নে মীমাংসিত হয়; নতুবা এই রাজ্য যে একেবারে ধ্বংস হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি কখনও জনসমাজকে হতাশ করিতেন না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিবার পরও বিস্তর লোক তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া যাইত।

তিনি এত অনাড়ম্বর ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে অনিচ্ছুক ছিলেন যে, কেহ কখনও তাঁহার ফটো তুলিতে গেলে তিনি তাহাতে কোন মতে রাজী হইতেন না। এইসঙ্গে তাঁহার যে প্রতিকৃতি ছাপা হইল তাহা অতি কষ্টে কোন কৌশলে হঠাৎ গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি বনেলী-রাজের কোন কার্য্যে কলিকাতার ব্যারিষ্টার স্যার গ্রিফিথ-

ইভান্সের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন এবং দরবারী পোষাক পরিয়া যখন তিনি ব্যারিষ্টারের গৃহ হইতে রাজার নিকট ফিরিতে-ছিলেন, তখন রাজ-সমীপে একজন ফটোগ্রাফার ছিল; রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি ফটো তুলাইতে বাধ্য হন। ইহা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের কথা। তিনি কখনও ঘোড়ার গাড়ীতে গমনাগমন করিতেন না, পুরাতন ধরণের শিবিকাই তাঁহার যান ছিল। পুত্রগণের বিবাহে তিনি পণ লইবার বিরোধী ছিলেন। তিনি আপন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে নিজ হইতে কোন পণ চাহেন নাই।

আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। শ্রীনাথবাবু পূর্ণিয়ায় সরকারী আফিসে কর্ম্ম করিতেন। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রম করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোপালচন্দ্র বহু টাকা দান করিতেন বটে, কিন্তু কেহ তাহা জানিতে পারিত না। অনেক দরিদ্র পরিবারকে তিনি সাহায্য করিতেন।

তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তবে তিনি প্রতিমা-পূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমতে সঙ্কীর্ণতা ছিল না।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি চারিদিনের পীড়ায় ভুগিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন উত্তরায়ণ সংক্রান্তি এবং সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছিলেন। তিনি যোগাসনের ন্যায় উপবিষ্টাবস্থায় দেহত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার চেতনা ছিল। তাঁহার মুখাবয়বে কোন প্রকার যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন্ সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা বলিয়াছিলেন। শেষ দিনে তিনি ঔষধ সেবন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাড়ী লোপ হইলেও তিনি অনেকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। মৃত্যুর

কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই সময় সিভিল সার্জ্জন নাড়ী দেখিবার জন্য তাঁহার হাত স্পর্শ করিলে তিনি তাঁহার হাত সরাইয়া দেন; কারণ সে সময় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করে—ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর ৩।৪ মিনিট পূর্ব্বে তিনি যখন একবার চক্ষু উন্মীলন করেন,তখন সিভিল সার্জ্জনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার হস্ত সরাইয়া দিয়া ছিলেন—ইহা বুঝিয়া মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইলেও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তৎপরে চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন। ডাক্তার তদ্দর্শনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, ইনি যে জেলার মধ্যে একজন মহৎ লোক একথা তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় তিনি স্পষ্টতঃ পাইলেন। তাঁহার বড় দুঃখ রহিল যে, এইরূপ একটি মূল্যবান্ জীবন তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। এইরূপে মনীষাসম্পন্ন গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। দরিদ্রেরা পিতৃহারা হইল মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং অন্যান্য সকলে একজন নেতা ও অকপট বন্ধু হারাইল বলিয়া অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুতে দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ হইল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের জন্য সকলেই প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিল। একখানি স্পেশাল ট্রেণে করিয়া তাঁহার শব গঙ্গাতটে মণিহারীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। কীর্ত্তনের দল তাঁহার শবের অনুগমন করিল। অনেক ভদ্রলোক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পূর্ণিয়া হইতে মণিহারীঘাট পর্য্যন্ত

গিয়াছিলেন। তদানীন্তন ইউরোপীয় রেলওয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার ও রেলের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শব চিতার উপর স্থাপনমাত্র যেন কি এক অজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোন বাধা-বিঘ্ন হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন একজন শুদ্ধাচার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেশান্তর হইতে আসিয়া শ্মশানঘাটে উপস্থিত থাকিয়া অন্তিমকালের কার্য্যাদিতে সহায়তা করিলেন। তখন ছোট লাট স্যার জন উডবরণ পূর্ণিয়ায় ছিলেন। তিনি তৎপরদিন জজ-কোর্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট পরিদর্শন করিবেন,—ইহা জানিয়া শুনিয়াও জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের বহু কর্ম্মচারী পূর্ব্ব রাত্রিকালে স্পেশাল ট্রেণে তাঁহার শবের অনুগমন করিয়া ছিলেন। কিন্তু তৎপরদিন প্রাতে পূর্ণিয়ায় ফিরিবার ট্রেণ ছাড়িবার সময় পর্য্যন্ত শবদাহাদি কার্য্য সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়ায় তাঁহারা কিছু বিচলিত হন। পরে গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুরোধে ষ্টেশন মাষ্টার সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য পূর্ণিয়া-গামী ট্রেণকে অতিরিক্ত এক ঘণ্টা আটকাইয়া রাখিবেন, ইহা জ্ঞাপন করিলেন। শ্মশানে বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন, রীত্যনুসারে প্রত্যেকেরই কয়েক কলসী জল দিয়া চিতাভস্ম ধুইবার কথা; কিন্তু তাহাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ও আত্মীয়েরা কলসীর জলে চিতাভস্ম প্রক্ষালন করিবার পরই গঙ্গার জল স্ফীত ও তীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সমস্ত চিতাভস্ম ভাসাইয়া দিয়া গেল। ফলে ভদ্রলোকদের জন্য ট্রেণকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল আটকাইয়া রাখিতে হয় নাই এবং তাঁহারা যথাসময়ে ট্রেণ ধরিতে পারিয়াছিলেন।

আবার তাঁহার শ্রাদ্ধের সময় যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা শুনিলে আরও অবাক্ হইতে হয়। তখন জুলাই মাস, চারিদিকে

প্রবল বর্ষা, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় কিংবা লোক-জনের ভোজনের সময় একবিন্দুও বৃষ্টিপাত হইল না। তাঁহার ন্যায় লোকের যেভাবে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন হওয়া উচিত ছিল, সেইভাবে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। যেই একদল লোকের আহারাদি শেষ হইয়া যাইত, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি নামিত যেন ভুক্ত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্যই। পুনরায় আর একদল লোকের আহার করিবার সময় উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ দিতেন। রাত্রিকালেও লোকজনের আহারের সময় পরিষ্কার আকাশ দেখা গিয়াছিল এবং আহারান্তে মুষল-ধারে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর জেলার ইউরোপীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও স্থানান্তর হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শোকসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়া 'বারে'র উকিলগণ বিশেষ সভা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পূর্ণিয়া লাইব্রেরীতে তাঁহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে।

তিনি বিধবা পত্নী, দুই পুত্র, দুই পৌত্র, এক পৌত্রী ও তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধব রাখিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। লোকে এখনও ভক্তিসহকারে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া থাকে।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতি পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। ১৯২৫ সালের ২৫শে অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন। ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। যেদিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেদিন ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল। তিনিও ধ্যানস্থা হইয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন এবং মণিহারী শ্মশানে তাঁহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট এবং পূর্ণিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়র উকিল। ৪২ বৎসর যাবৎ তিনি তথায় ওকালতি করিতেছেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শশিভূষণ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং উদাসী ভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর কিছু পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং অনুমান যে, তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

গোবিন্দবাবু সত্য সত্যই মহাত্মা ছিলেন এবং বোধ হয় লোক-শিক্ষার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থ পুরুষ ছিলেন। দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকারিতা তাঁহার জীবনের অলঙ্কার ছিল। পূর্ণিয়ায় বোধ হয় শীঘ্র তাঁহার স্থানপূর্ণ হইবে না। মহাকবি সেক্স্‌পীয়রের ভাষায় বলা যায়—

He was a man, take him for all, in all I shall not look upon his like again.

বাঙ্গালা ১২৭২ অব্দের ১২ই আশ্বিন সাতকড়িবাবু ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন মহাষ্টমীর শুভদিন। তিনি অতি অল্প বয়সেই পূর্ণিয়া স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং একবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পূর্ণিয়া জেলা-কোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। শীঘ্রই তিনি আপন প্রতিভা-বলে উক্ত 'বারে'র প্রধান উকিলমধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ও পাটনা হাইকোর্টের উকিল হন। এক্ষণে তিনি পূর্ণিয়া বারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এডভোকেট, ৪২ বৎসর যাবৎ তিনি পূর্ণিয়ায় ওকালতি করিতেছেন। তিনি মোকদ্দমা পরিচালনার সময় ওজস্বিনী ভাষায় ইংরাজীতে অভিভাষণ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ খ্যাতিও আছে। তাঁহার স্বাস্থ্য অতি ভালই ছিল এবং তিনি বিশেষ কর্ম্মপটু ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মী খুব কমই দেখা যাইত এবং তিনি দৈনিক ১৫।১৬ ঘণ্টা কাজ করিতে

পারিতেন। ওকালতির প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে নিজের আইন-ব্যবসা ছাড়া প্রায়ই অশ্বারোহণে ২৫ হইতে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নীলের কারখানায় গমনাগমন ও তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করিতে হইত। যখন তিনি কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি তাঁহার একজন ডাক্তার আত্মীয়ের নিকট কিছু কিছু ডাক্তারী শিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। তিনি বাড়ীতে অনেক এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখিতেন এবং নিজ পরিবারের মধ্যে পীড়াদি হইলে তিনিই নিজে চিকিৎসা করিতেন এবং অনেক দরিদ্রকেও তিনি ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাযুক্ত। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতেই তিনি তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঐ বয়স হইতেই তিনি পরিবারস্থ পীড়িত লোকজনের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং তজ্জন্য আবশ্যক হইলে রাত্রি জাগরণ করিতেন। বহুকাল যাবৎ তিনি বানেলী-রাজের আইনের পরামর্শদাতা ছিলেন; উক্ত বৃহৎ রাজ্য-পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্কুল কিংবা কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি যে সমস্ত গদ্য-পুস্তকাদি বা সংবাদপত্র পাঠ করিয়াছিলেন, আজিও তিনি সেসমস্ত অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে।

কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কখনও বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন না। পিতার আদেশ ছিল, তিনি যেন কখনও কোন থিয়েটারে যোগদান না করেন, সেই আদেশানুসারে তিনি পাঠ্যাবস্থায় একদিনের জন্য থিয়েটার দেখিতে যান নাই। ঐ সময়ে তিনি যখনই অবসর পাইতেন, তখনই ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত

গন্থ পত্থ সঙ্কলন করিয়া রাখিতেন। Treasury of Knowledge নামে অভিহিত পুস্তকে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন। এই পুস্তকে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক বিষয় আছে এবং আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকখানির আয়তন প্রায় ৭ শত পৃষ্ঠা এবং নানা বর্ণের কালিতে সুন্দর অক্ষরে লিখিত।

সাতকড়িবাবু অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্, মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, পূর্ণিয়া সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে একাদিক্রমে ২৫ বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ণিয়া ডিস্‌পেন্‌সারী কমিটি ও জেলা স্কুলের ভিজিটিং কমিটির এবং জেলা-জেলের বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। সমবায় ঋণদান সমিতিরও তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। এইসমস্ত কার্য্যের জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। তাঁহাকে অস্ত্রআইনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে ভাগলপুর বিভাগের দরবারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি মহৎ পিতার পুত্র এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেওঘরের পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মহাত্মাকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হন। পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তাঁহাদের বংশ রাজভক্তির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। দরিদ্রকে তিনি চিরদিন সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন এবং জনহিতকর কার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। জনসাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকে। তিনি তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির একজন সদস্য : পরলোকে তাঁহার বিশ্বাস আছে। তাঁহার দুই পুত্র. জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারে সরকারী চাকুরী করেন; বর্ত্তমানে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট সব-রেজিষ্ট্রার-পদে নিযুক্ত আছেন।



শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পৃষ্ঠায় ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষণে তদতিরিক্ত বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া নিম্নে সেগুলি প্রকাশিত করিলাম।

সাতকড়িবাবুর পিতৃব্য-পুত্র শ্রীযুত তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গেরের একজন শ্রেষ্ঠ উকীল ও সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন।

সাতকড়িবাবু নদীয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত জমীদার-বংশে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার পত্নীও বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী। তাঁহার পত্নী ধর্ম্মপ্রাণা, নিরহঙ্কারা ও করুণহৃদয়া এবং সকলের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করিয়া থাকেন এবং গ্রামস্থ মহিলাগণ অবধি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন।

সাতকড়িবাবুর মাতৃদেবীও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন এবং বহু তীর্থ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। ইংরেজী ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে ৭৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন। মণিহারীতে গঙ্গার তীরে তাঁহার দেহের সৎকার হইয়াছিল।

শ্রীযুত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহৎ পিতার পুত্র এবং তদীয় পিতৃদেবের পবিত্র পদাঙ্কের অনুসরণ তিনি করিয়া আসিতেছেন। তিনি এমনই সৌভাগ্যবান্ যে, তদীয় পিতৃবিয়োগের অল্পদিন পরেই তিনি যোগ্য ইষ্টগুরু লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই গুরুদেব দেওঘর-নিবাসী পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাপুরুষ ও পরম যোগী। তাঁহার ঐশী ও অলৌকিকী শক্তি আছে।

সাতকড়িবাবু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়চেতা পুরুষ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি কোমল। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। জীবমাত্রেরই কষ্টে তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়া থাকে এবং তিনি তাহার সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স যখন ১৪।১৫ বৎসর সেই সময় হইতে তিনি তাঁহার বাড়ীতে ছাগবলি বন্ধ করিয়া দেন। তৎপূর্ব্বে ছাগবলি তাঁহার বাড়ীতে প্রচলিত ছিল।

তিনি নিত্য গীতাপাঠ ও গৃহদেবতার পূজা এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতামাতার স্মৃতিপূজা ও ইষ্টদেবের পূজা নিয়মিতভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট কারুকার্য্যযুক্ত এবং খিলান ও কার্ণিশ ও চূড়া ও ত্রিশূলাদি-বিশিষ্ট একটী শিবমন্দিরের চিত্রাঙ্কন আছে; তদভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ এবং মন্দিরের গাত্রে ময়ূর, লতাপত্র ও হস্তী প্রভৃতি বস্তুর চিত্র অঙ্কিত এবং এই মন্দির ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের চিত্রাঙ্কনাদি অলক্তকের লাল বর্ণের কালিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা অক্ষরে লক্ষ দুর্গানামে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে লিখিত ও সমাপিত। দেখিতে অতীব সুন্দর এবং অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্নের পরিচায়ক।

তিনি ভারতের থিওসফিক্যাল বা তত্ত্ববিদ্যাসমিতির সদস্য এবং অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। পূর্ণিয়া ও দেওঘরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে, দেওঘরের কুষ্ঠাশ্রমে, পূর্ণিয়ার ভাট্টা শিশু ও বালিকা বিদ্যালয়ে, পূর্ণিয়ার আঞ্জুমান ইসলামিয়ায়, পূর্ণিয়া ও দেওঘরের বাপ্তিষ্ট মিশন ও আর-সি চার্চ্চে এবং মধুবনীর বিহারী বালিকা বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুর বিভাগের জেলাবোর্ড সমূহের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল,

কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধু ভাগলপুরের বাবু (পরে রায় বাহাদুর) শিবশঙ্কর সহায়ের অনুকূলে দ্বন্দ্বক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

তিনি পূর্ণিয়া সদর বার এসোসিয়েসন বা উকীল-সভার সেক্রেটারী। এই পদ প্রেসিডেন্টের পদেরই তুল্য। তিনি বহুকাল যাবৎ পূর্ণিয়া ভাট্টা শিশু ও বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির একজন প্রধান সদস্যরূপে কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

কৃষি ও ফলের চাষের উপর তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ। তিনি কয়েকটী স্থানে আদর্শ কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপন ও বড় বড় ফলের বাগান করিয়াছেন। পূর্ণিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে নীলগঞ্জ নামক স্থানে তাঁহার সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্র ও ফলের বাগান আছে। এই স্থানে তাহার একটী বড় নীলের কুঠী আছে। এই কুঠিটী পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই কুঠী প্রথম তৈয়ারী হয়। ডাক্তার হাণ্টার সাহেবের 'ষ্ট্যাটিসটিক্যাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। তিনি পিতৃদত্ত সম্পত্তির অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ-রাজভক্তি তাঁহার বংশগত। তিনি প্রায় ১৫।২০ বৎসর যাবৎ পূর্ণিয়া জিলা স্কুলের 'ব্রিটিশ রাজভক্তি' সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক ছাত্রকে একটী করিয়া পদক পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ছাত্রগণকে সংযত রাখিবার পক্ষে তিনি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট যে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র (Certificate of Honour) প্রদান করিয়াছেন তাহার অনুলিপি ও মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"By Command of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India in Council, this Certificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty

King Edward VII Emperor of India to Babu Satkori Banerjee son of Babu Gobinda Chandra Banerjee, in recognition of his services as Chairman of the Sadar Local Board, Municipal Commissioner, Member District Board Purnea and of his being a good landlord."

(Sd) J. A. Bourdillon.

1st January, 1903.

Lieutenant-Governor of Bengal.

অর্থাৎ ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও স-কৌন্সিল বড়লাট বাহাদুরের আদেশে মহামহিম ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মহিমান্বিত নামে বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণিমার সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান-রূপে, মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনাররূপে, পূর্ণিয়া জেলা-বোর্ডের সদস্যরূপে এবং শান্তশিষ্ট ভূম্যধিকারীরূপে তিনি যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন তাহার স্বীকৃতি-স্বরূপ এই প্রশংসাপত্র প্রদান করা হইতেছে।

১লা জানুয়ারী ১৯০৩ সাল — (স্বাক্ষর) জে-এ বোর্ডিলন, বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণর

একাদশ খণ্ড
যন্ত্রস্থ

শ্রীহট্ট-পাইলগাঁওয়ের সুখময় চৌধুরীর বংশ

শ্রীহট্ট পাইলগাঁওয়ের সুখময় চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কানাই ধর চিত্রগুপ্ত ধরের পুত্র ছিলেন। চিত্রগুপ্ত প্রাচীন মঙ্গলকোট সহরে বাস করিতেন। এই মঙ্গলকোট বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার একটি অংশ। এই মঙ্গলকোটে শ্রীমন্ত সদাগর বাস করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ও পৌরাণিক আখ্যায়িকায় মঙ্গলকোটের নাম দৃষ্ট হয়। প্রায় অষ্টশতাব্দী পূর্ব্বে কানাই ধর এই জেলাতে যান এবং আতুয়াজান পরগণার পাইলগাঁয়ে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তিনি পৈতৃক নিবাস কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার কোনই স্মারকলিপি নাই। তিনি পাইলগাঁয়ে স্থায়ী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ সেখানে বাস করিতেছেন। এই বংশের বর্ত্তমান সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুখময় চৌধুরা কানাই ধর হইতে অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ। কানাই ধর হইতে দ্বাদশ বংশধর মাধবরামেব সময় এই বংশ জ্ঞানে, গুণে, ঐশ্বর্য্যে ও সম্পদে গণনীয় হইয়া পড়ে এবং সাজাহান বাদসা গাজীর তদীয় একত্রিংশবর্ষীয় রাজ্যাভিষেকের সময় পুত্র সাহা মহম্মদ সুজা বাহাদুর কর্ত্তৃক আতুয়াজান পরগণায় প্রধান চৌধুরী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১০৬৮ হিজরিতে মাধব-রামকে সনন্দ দেওয়া হয়। সেই সনন্দে আছে যে, মাধবরাম তাঁহার পিতৃপিতামহের আবাস হইতে ৮৭০০৲ কাহন কড়ির জমা দখল করিয়া আসিতেছেন এবং যত হাকিম আমিন জায়গীরদার থাকিবে, তাঁহারা

মাধবরামকে পরগণার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইবেন এবং ঐ পরগণার চৌধুরী মুতাকাডিম ও প্রজাবর্গরা যেন তাঁহার পরামর্শের অতিরিক্ত কোন কার্য্য করে। তাঁহাকে এই ক্ষমতা-ভোগের জন্য যে অধিকার দেওয়া হইল, তিনি সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন। তাঁহাকে চৌদারের নিষ্কর দেওয়া হইল এবং খানাবাড়ীও বিনাকরে দেওয়া হইল। তিনি রায়ত-বর্গের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সরকারের মঙ্গলের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

এই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া মাধবরামের ক্ষমতা বাড়িয়া গেল এবং আজ পর্য্যন্ত আতুয়াজান পরগণায় সামাজিক, পারিবারিক, বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারেই এই বংশের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

চৌধুরী মাধবরামের ভ্রাতা শ্রীরামের পুত্র চাঁদকে সে সনন্দ দেওয়া হয় সেই সনন্দ-পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বপুরুষদিগের সময় হইতেই শ্রীরামের বংশকে কানুনগো উপাধি দেওয়া হইতেছিল। কানুনগো পদ অত্যন্ত সম্মানজনক এবং শক্তিপ্রদ ছিল। চৌধুরী মাধবরামের অনেক পূর্ব্বেই এই বংশ প্রতিপত্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃত-পক্ষে মাধবরামের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অসাধারণ প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিতেন, সেই প্রতিপত্তির জন্য আতুয়াজান পরগণার প্রধান চৌধুরী বলিয়া তাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চাঁদ পর্য্যন্ত কানুনগো উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরেই এই বংশের উপাধি চৌধুরীই প্রধান দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধবরাম চৌধুরীর পৌত্র মোহনরাম চৌধুরীর নাম অতঃপর উল্লেখযোগ্য। ইনি ৺মদনমোহন গৃহবিগ্রহ ও মন্দির স্থাপনা করিয়া উৎকৃষ্ট সেবা-ব্যবস্থা করেন। চৌধুরী বংশ অদ্যাবধি ৺মদনমোহনের

যথারীতি সেবা করিয়া আসিতেছেন। একটী গ্রাম ও একখানি বাজারের আয় তজ্জন্য বরাদ্দ ছিল। তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ সদর কালেক্টরি অফিসে তিনি সকল চৌধুরী, পাটোয়ারী এবং তালুকদারগণের পক্ষ হইতে রাজস্ব প্রদান করিতেন। মোহনরাম চৌধুরীর চারিপুত্র—দুর্ল্লভরাম, গোলাপরাম, হুলাসরাম ও জগজ্জীবন। এই চারিভাগের জমিদারি যাটহাজার বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত ছিল; এই পরগণায় মোট ১৪৪ হাজার বিঘা জমি ছিল, তন্মধ্যে মোহনরামের চারি পুত্র ৬০ হাজার বিঘা জমির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে বহু তালুকদার ছিল এবং তালুকদারেরা এই পাইলগাঁয়ের চৌধুরী-দিগের মারফতে তাঁহাদের আপন আপন রাজস্ব প্রদান করিতেন। সে সময়ে রাজস্ব অত্যন্ত বেশী ছিল এবং এই বংশের যাঁহারা দরিদ্র অংশীদার তাঁহারা কেহ কেহ তালুকদারের নিকট তাঁহাদের জমিদারীর অংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বানিয়া চংয়ের জমিদারদের সহিত পাইলগাঁওয়ের চৌধুরী বংশের মামলা হয়। এই মামলা সদর দেওয়ানী আদালত পর্য্যন্ত যায়, পরে যে মামলা হয় সেই মামলায় হুলাসরাম চৌধুরী অগ্রণী ছিলেন। বানিয়া বংশের জমিদারেরা আতুয়াজান পরগণায় কিছু জমি নিজেদের বলিয়া দাবী করেন, ফলে পাইলগাঁওয়ের চৌধুরী বাবুদের সহিত তাহাদের মামলায় পাইলগাঁওয়ের চৌধুরী বাবুদের জয় হয়। জগজ্জীবন চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী আপন বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিভা-বলে আতুয়াজান, কিসমৎ এবং শিকণ্ডনেতা এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী পরগণায় খুব প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি-নিয়তই জমিদারীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং তিন পরগণার চৌধুরী, পাটোয়ারী ও তালুকদারদের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী

মামলা সকল আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। মাসের পর মাস ধরিয়া তিনি অনেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা শুনিয়া তাঁহার লিখিত রায় প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার বিচারকার্য্য দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার বিচার-পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এখনও দেশের মধ্যে নানাস্থানে তাঁহার লিখিত রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রায়-পাঠে জানা যায়, তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল। শিক্ষিত মুসলমানেরা তাঁহাকে মৌলবী বিজয়নারায়ণ বলিতেন। তরবারী খেলায়ও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র ব্রজনাথ চৌধুরী পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট বারের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। পরগণার বাহিরে তিনি বিস্তৃত জমীদারী কিনিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম এই জেলায় চায়ের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীহট্ট হাই স্কুলটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এই স্কুলটি পরে গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এখন এই স্কুলের নাম শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল। শ্রীহট্ট সহর হইতে চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্কুল কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল, তখন তিনি জেলা বোর্ড কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

হিন্দু তীর্থযাত্রীদের অবস্থানের জন্য তিনি বৃন্দাবনে একটি "কুঞ্জ" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় শ্রীহট্ট জিলায় অনেকগুলি পরগণার প্রধানগণ বিবাহের অনাবশ্যক জাঁকজমকশালী অশাস্ত্রীয় পদ্ধতি পরিবর্জ্জন করেন। এই পদ্ধতিগুলি হইতে অনেক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইত। তিনি

বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাকে অস্ত্র আইনের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। ওকালতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে পাইলগাঁওয়ে তাঁহার নিজের বাটীতে আদালত বসাইয়া দিরাই ও জগন্নাথপুর থানার অধীনে যে সমস্ত অভিযোগকারী আছে তাহাদের মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচার করিবার অধিকার দেন। সালিসীতে তিনিও অনেক মূল্যবান সম্পত্তিঘটিত বিরোধ মীমাংসা করিয়াছেন; সে সকলের রায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

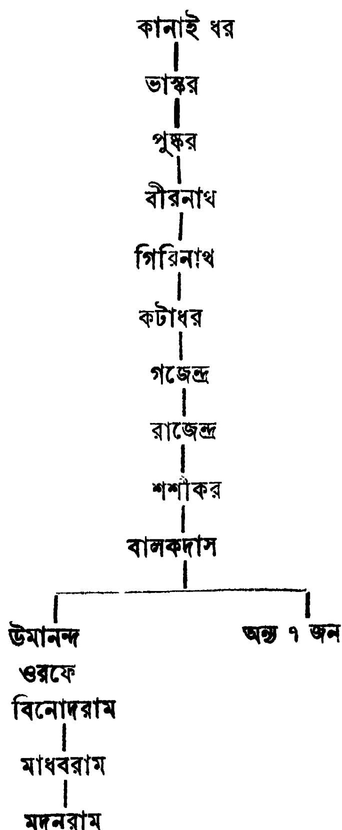
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রসময় চৌধুরী অতি সাদাসিদে প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি জমীদারীর আয়তন অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির যাহা কিছু বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল তিনি তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্র এম্-এ, বি-এল্ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি-এসসি, বি-এল; তিনি একজন কৃষিতত্ত্ববিদ্। তৃতীয় পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি-এ।

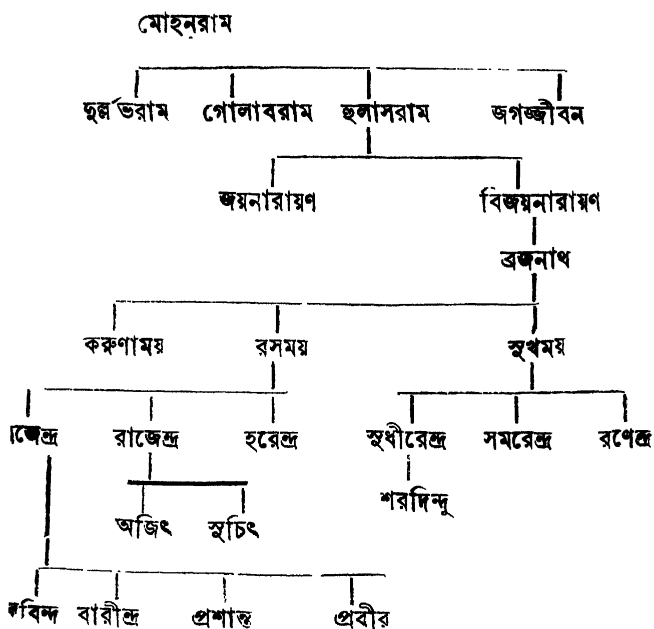
এই বংশের বর্ত্তমান প্রধান ব্যক্তি রায় শ্রীযুক্ত সুখময় চৌধুরী বাহাদুর সি-আই-ই। তিনি প্রথমে শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই জেলার সমস্ত প্রকার আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েই তাঁহাকে বিশ্বাস করেন। তিনি ২৯ বৎসরের অধিক কাল অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কাজ করিতেছেন। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তিনি যে সুবিচারের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য পূর্ব্ববঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট, মাননীয় হাইকোর্ট ও আসামের গবর্ণর তাঁহার প্রশংসা

করিয়াছেন। তিনি মিউনিসিপাল কমিশনার। সাড়ে দশ বৎসরের উপর কাল তিনি তিন বার শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে শ্রীহট্ট কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা অবধি তিনি ইহার সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন প্রাইজ লাইব্রেরীর তিনি সতর বৎসর কাল অবৈতনিক সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডিস্‌পেনসারী কমিটির তিনি একজন সভ্য এবং সেণ্ট আম্বুলন্স সোসাইটীর তিনি একজন আজীবন সদস্য। তাঁহার পিতার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি দাতব্য-চিকিৎসালয়ে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার টাকাতেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্ত্রীলোক রোগীদের চিকিৎসার জন্য "ব্রজনাথ চৌধুরী মহিলা বিভাগ" নামে একটী স্বতন্ত্র ওয়ার্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তিনি সভ্য; বালকদের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল ও বালিকাদের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের তিনি সভ্য. স্বদেশী শিল্প-কারখানার তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক; ভারত সমিতি ও অল ইণ্ডিয়া টি এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী নামক তুইটী দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক টাকার সেয়ার কিনিয়াছেন। শুধু টাকার সাহায্য করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। এই তুইটী দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ১৯১৯ সালে যে বিশেষ ফৌজদারী আদালত (Special tribunal) গঠিত হয় তিনি তাহাতে একজন বে-সরকারী সদস্যরূপে কাজ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুইবার সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন; সরকার তাঁহাকে অস্ত্র-আইনের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ১৯১৫ সালে তিনি প্রথমে "রায় বাহাতুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯২৫ সালের নববর্ষে তাঁহাকে "সি-আই-ই" উপাধি দেওয়া হয়।

নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা-পরিপাটীর জন্যও শ্রীহট্ট সহরে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। নিজ গ্রামে ৺ব্রজনাথ হাই স্কুল স্থাপনা করিয়া তাহার সমস্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইনি একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী।

নিম্নে এই বংশের বংশতালিকা দেওয়া হইল :—




মোহনরাম
দুর্ল্লভরাম
গোলাবরাম
হুলাসরাম
জগজ্জীবন
জয়নারায়ণ
বিজয়নারায়ণ
ব্রজনাথ
করুণাময়
রসময়
সুখময়
রাজেন্দ্র
হরেন্দ্র
সুধীরেন্দ্র
সমরেন্দ্র
রণেন্দ্র
অজিৎ
সুচিৎ
শরদিন্দু
বারীন্দ্র
প্রশান্ত
প্রবীর



স্বর্গীয় হরিমোহন দালাল

বসিরহাটের জমিদার ৺হরিমোহন দালাল

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

মানব-সমাজে যে সকল মহাত্মা অসামান্য বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ৺হরিমোহন দালাল মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। জেলা ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট গ্রামে সন ১২৫৫ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ৺গুণনাথ দালাল মহাশয় তাঁহার পিতা। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতামহ ৺হলধর দালাল মহাশয় বসিরহাট গ্রামের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ৺হরিমোহন দালাল মহাশয়ের পিতৃবিয়োগের পর বহুদিন যাবৎ তাঁহার পিতামহ ৺হলধর দালাল মহাশয় জীবিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাহার পিতামহ সুপুরুষ ছিলেন এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, অসাধারণ ধৈর্য্য ও মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন। ৺হরিমোহন দালাল মহাশয় তাঁহার পিতামহের সেই গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালে একজন জ্যোতিষী তাহার জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ বালক কালে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন এবং নিজ জীবনে যথেষ্ট অর্থ, সম্পত্তি, যশঃ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবেন। সেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতি বর্ণে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

৺হলধর দালাল মহাশয়ের পাঁচ পুত্র—(১) গুণনাথ দালাল, (২) যাদবচন্দ্র দালাল, (৩) মধুসূদন দালাল, (৪) মহিমচন্দ্র দালাল ও (৫) জয়-

নারায়ণ দালাল। গুণনাথ দালাল মহাশয় তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় দুই পুত্র (১) হরিমোহন দালাল ও (২) মতিলাল দালাল ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

৺হরিমোহন দালাল মহাশয় চারি পুত্র (১) শ্রীযুক্ত রামলাল দালাল, (২) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল, (৩) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দালাল ও (৪) শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দালাল ও দুই কন্যা রাখিয়া গত ১৩৩২ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখে ৺কাশীধামে ৭৭ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে বাবা বিশ্বনাথের নাম জপ করিতে করিতে ৺কাশীপ্রাপ্ত হয়েন।

তাঁহার চারি পুত্র এক্ষণে জীবিত আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং বর্ত্তমানে করপোরেশনের একজন কাউন্সিলর। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িলাল নাথ আলিপুর জজ আদালতের উকিল এবং ওকালতিতে বিশেষ পশার-প্রতিপত্তি করিয়াছেন।

৺হরিমোহন দালাল মহাশয় একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার সহজ বুদ্ধি অসামান্য ছিল। অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার পিতামহের অত্যধিক স্নেহবশতঃ ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার যৎসামান্য হইয়া থাকিলেও, তিনি নিজ জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রভূত অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা ও ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারা যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহার অত্যন্ত প্রখর ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ৺মতিলাল শীলের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক সব-ডিবিসনের অন্তর্গত কাশীজোড়া পরগণার ৮১ মৌজা খরিদ করিয়া উক্ত মহাল সুশাসিত করিবার সময় পরলোক গমন করেন। সুন্দর বন-সংক্রান্ত বিস্তর জঙ্গল তিনি বন্দোবস্ত লইয়া জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মই ছিল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। এ পৃথিবী

জীবের কর্ম্মভূমি এবং এখানে কর্ম্ম করিবার জন্য মানুষের জন্মপরিগ্রহণ—ইহাই ছিল তাঁহার স্থির বিশ্বাস। কর্ম্মহীন জীবন পশুর জীবন এবং কর্ম্মই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলে—ইহাই ছিল তাঁহার উক্তি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি বিষয়-কর্ম্মে রত ছিলেন। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করা তাহার স্বভাব ছিল। আলস্য ও আমোদপ্রিয়তা তাঁহাকে কোন দিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার মনের তেজ অসামান্য ছিল। তিনি বলিতেন, "জীবনে জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় কাজ করি নাই, সুতরাং মনের বল কেন কমিবে?" কর্ত্তব্য-সাধনে তিনি নির্ভীক ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত বৈষয়িক ব্যাপার লইয়াও তিনি অমিতসাহসে কার্য্য করিয়াছেন। এক সময়ে আলিপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Prenticeএর সহিত বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া তাঁহার তর্কবিতর্ক হয়, কিন্তু সেই নির্ভীক পুরুষ সমানভাবে তাঁহার সহিত প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইয়াছিল। কোন সময়ে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে বসিরহাটের সব-ডিভিসনাল অফিসার তাঁহার মহালের খাস জমির ধান্য প্রজাকে আদালত হইতে হুকুম দিয়া দেওয়ায় তিনি সেই অফিসারের বিরুদ্ধে আলিপুরে ক্ষতি-খেসারতের মোকর্দ্দমা আনয়ন করিতে সাহসী হয়েন। সেই সব ডিভিসনাল অফিসার মোকর্দ্দমা রুজুর পরে তাঁহার বাটীতে আসিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইতে বাধ্য হয়েন। অন্যায় কর্ম্মকে তিনি চিরদিনই আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। পিতামাতা ও গুরুজনের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্বগ্রাম বসিরহাটে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া তাঁহার পিতামহ ৺হলধর দালাল মহাশয়ের নামে Female Charitable Hospital and Dispensary, তাঁহার পিতা ৺গুণনাথ দালালের স্মৃতি-চিহ্নার্থ Girl School ও তাঁহার মাতার নামে বসিরহাট হাই স্কুলের একটী Block ও

বসিরহাটের প্রসিদ্ধা কালীমাতার দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তদঞ্চল-বাসীর যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বহুকাল হইতে বহু দরিদ্র অসহায় স্বজাতীয় ছাত্র তাঁহার কলিকাতার রান্না-বাটীতে খাইয়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। প্রত্যেক বৎসর ৭।৮ জন ছাত্রকে অন্ন দান করিয়া তাহাদের জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কৃতী সুসন্তান নরেন্দ্রবাবু তাঁহার পিতার ঐ দানশীলতা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ লবণ-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বহুকাল যাবৎ পাটের ব্যবসায় করিয়া ইউরোপে পাটের গাঁইট বিক্রয় ও রপ্তানি করিতেন।

জীবনে যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিত্বে, গাম্ভীর্য্যে, সরল ব্যবহারে, বুদ্ধিমত্তায়, নির্ভীকতায় ও স্পষ্ট-বাদিতায় মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি জীবনে কার্য্যসিদ্ধির জন্য কখন হীন কপটতার বা তোষামোদের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। এইরূপ মহৎ গুণাবলী আজকালকার দিনে দুর্লভ। সন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল যখন বসিরহাটে গমন করেন তখন His Excellency তাঁহার দানশীলতার জন্য তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন। অপব্যয় করাকে তিনি পাপ মনে করিতেন। তিনি সদ্‌ব্যয়ী ও অন্যের প্রতি সম্ভ্রমশীল ও পরের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। ধনগর্ব্ব কোন দিনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে বসিরহাট অঞ্চলে প্রায় ৭০০ দরিদ্র-নারায়ণের প্রত্যেককে বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার গোঁড়ামি ছিল না। হিন্দু মুসল-মানকে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন, এবং কোন মানুষকে কখন



শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দালাল, এড্‌ভোকেট

ঘৃণা করিতেন না। কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নং প্রাতরন্ততঃ যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"—এই ঋষিবাক্যের সত্যতা তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, ন্যায়ানুসারে কর্ম্ম করাই জীবের কর্ত্তব্য। ফলাফল ভগবানের হস্তে। তিনি ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মকে কোন দিনই উপেক্ষার বিষয় মনে করেন নাই।

সাধ্যানুসারে ও ন্যায়ানুসারে কর্ম্ম করিয়া যাও, ফল অদৃষ্টের উপর—ইহাই ছিল তাঁহার উক্তি। এই অসাধারণ কর্ম্মবীর কোন দিনই বিপদে কিম্বা শোকে বিচলিত হয়েন নাই বা স্বীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং নিজেও ঐ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন এবং কোন্ মানুষ কি উদ্দেশ্যে তাহার সহিত মিশিতেছে তাহা তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারিতেন।

প্রখর সাধারণবুদ্ধি, প্রভূত অধ্যবসায়, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, মানসিক বল এবং কর্ম্মে একনিষ্ঠতাই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বগুলি মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমানভাবে ছিল। শোকে তিনি কোন দিন কাতর হন নাই। আনন্দে তিনি কোন দিনই কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করেন নাই। আহারে, বিহারে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে কোন দিনই তিনি বিচলিত হন নাই। সর্ব্ববিষয়ে তিনি পরিমিত ছিলেন। সংসারের মায়া কোন দিনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও চতুর্থ পুত্র পরলোক প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মত কোন দিনই তিনি শোকে বিচলিত হন নাই।

তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবু পিতার ন্যায় গভর্ণমেণ্টের নিকট যোগ্য সম্মান পাইতেছেন।

গত ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বসিরহাটে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য বাঙ্গালার গবর্ণর Sir Stanley Jackson বসিরহাটে গমন করিলে নরেন্দ্রবাবু বসিরহাট ষ্টেসনে গভর্ণর মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বসিরহাটের সাব-ডিভিসন্যাল অফিসার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েন এবং আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বিঞ্জম্যান গভর্ণর বাহাদুরের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলে গভর্ণর বাহাদুর করমর্দ্দনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন।

৺হরিমোহন দালাল মহাশয়ের জীবনী সাধারণের পক্ষে প্রভূত শিক্ষাপ্রদ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের মানসিক বল, ধৈর্য্য, প্রখর সাধারণবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠা বাস্তবিক আধুনিক যুগে সুদুর্ল্লভ।



শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দালাল

ওকড়সা-চৌধুরীবংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ রাজা রায় পরমানন্দ চৌধুরী। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর শুদ্ধ (শ্রেষ্ঠ) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। রাজা রামজীবন ইঁহার প্রপৌত্র। রামজীবনের পুত্র সত্রাজিৎ রায় চৌধুরী নবাব সিরাজউদ্দৌলার উজীরী-পদ প্রাপ্ত হইয়া মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জিয়াগঞ্জে দালিমতলা নামক স্থানে বাস করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্ব-দায়ে নবাব কর্ত্তৃক বন্দী হইলে সত্রাজিৎ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ সহায়তা করায় নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সত্রাজিতের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। এই কথা প্রচার হইলে সত্রাজিৎ প্রাণভয়ে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র পরমানন্দের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা সিংহবাহিনী দেবী মূর্ত্তি ও কুল-পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী নদীয়া জেলার রূপ-দহ গ্রামে গুপ্তভাবে কাশীনাথ নামধারণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তথায় মহারাজের অনুগ্রহে অনেক ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এখনও রূপদহে দোহরা গড় নামক বাটীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। পলাশী যুদ্ধে ইংরাজ কর্ত্তৃক নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হইলে, তাঁহার নবাবীর অবসানে ইংরাজ ক্রমশঃ স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের রাজত্বের প্রারম্ভে ইংরাজ সৈন্য নানা স্থানে উপদ্রব করিতে থাকে। একদিন জনকয়েক গোরা সৈন্য খড়িয়া নদীতীরস্থ রূপদহে উপস্থিত হইয়া কাশীনাথের পূজার দালানে পায়রা শিকার, কার্ণিশ ভাঙ্গা, বালকদিগকে ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি উপদ্রব করে। শুদ্ধ এই এক ক্ষেত্রে নয়, বারম্বার এইরূপে উপদ্রুত হইয়া তিনি প্রাণ ও মানের ভয়ে রূপদহ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলে মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে রূপদহ ত্যাগ করিতে দেন নাই। কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা রূপদহ ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার মণ্ডল গ্রামে বাস করেন এবং তাঁহার কুলপুরোহিত নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। এখনও উক্ত পুরোহিত-বংশধরেরা ওকড়সাহা-চৌধুরী বংশের পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছেন। কুলদেবতা সিংহবাহিনীও ইহাদের গৃহে নিত্য নিয়মিত পূজিত হইতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। রূপদহে আজও কাশীনাথের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

কাশীনাথের পুত্রেরা মণ্ডলগ্রামে কিছুদিন বাস করার পর তথায় বসবাসের অসুবিধা বিধায় কসা গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় সম্পত্তিও করেন। এখনও কসা গ্রামে তাঁহাদের ৯২৮ নং বর্দ্ধমান কালেক্টরী-ভুক্ত সম্পত্তি আছে। কাশীনাথের পুত্রগণ কোন কর্ম্মোপলক্ষে ওকড়সা গ্রামে আসিয়া উক্ত গ্রামকে তাঁহাদের বাসোপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন এবং কসা হইতে ওকড়সা গ্রামের দক্ষিণ বেগুনবাড়ী নামক স্থানে বাস করেন।

কাশীনাথের ছয় পুত্র। ১ম রাধাকান্ত, ২ রামকান্ত, ৩ রমাকান্ত, ৪ কৃষ্ণকান্ত, ৫ রতিকান্ত ও ৬ কালীকান্ত। কৃষ্ণকান্ত ওকড়সা হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁওতা গ্রামে গিয়া বসতি করেন। কালীকান্ত উক্ত জেলার অন্তর্ভুক্ত দাঁড়কা মৌলা গ্রামে অধিবাস করেন। এই দুই ভ্রাতার বংশধরেরা বিবিধ ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে ওকড়সা যাতায়াত করিতেন। অনেক দিন হইল, তাঁহাদের সে গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম পুত্রের বংশধরেরা আজও ওকড়সা গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

কাশীনাথের প্রপৌত্র (১ম ও ৫ম পুত্রের পৌত্র) হরমোহন ও বিজয়গোপাল একদা ওকড়সার গণেশচন্দ্রের ভবনে একখানি লেখ্য পত্রে

দেখেন,—'মুরশিদবাদ দালিমতলার বাড়ীতে পনর লক্ষ মুদ্রা সত্রাজিৎ কর্ত্তৃক নিহিত আছে।' এজন্য তাঁহারা তথায় গমন করেন। এত টাকা যে তাঁহাদের হস্তগত হইবে, তাহা তাঁহাদের মনে না থাকিলেও, অন্ততঃ সেই স্থানটী দেখিবার জন্য তাঁহাদের অন্তরে বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছিল। সেখানে গিয়া দেখেন, তখন তথায় লছমীপৎ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বনজঙ্গল-পূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকরাশি সুন্দর সৌধমালায় পরিণত হইয়া স্থানটীকে সম্যক্ পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। সেই দৃশ্যেই তাঁহারা সানন্দে গৃহ-প্রত্যাগত হয়েন।

রাধাকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দমোহন চৌধুরী মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার স্বখাত পুষ্করিণী আনন্দসাগর এখনও বিদ্যমান থাকিয়া গ্রামের হিতসাধন করিতেছে। রাধাকান্তের ৪র্থ পুত্র কৃষ্ণকেশব বর্দ্ধমানের তেওয়ারী বাবুদের নিকট অনেক সম্পত্তি পত্তনী লয়েন। তাঁহার পৌত্র রাখালদাস চৌধুরী একজন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ছিলেন। তাঁহার নাম সঙ্গীত-সম্প্রদায়ে সুপরিচিত। তিনি কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভায় কিছুদিন গীতবাদ্যের আলোচনায় থাকিয়া বিশেষ খ্যাতি ও আদর-আপ্যায়ন লাভ করেন। তাঁহার অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার আর একটী বেশ গুণ ছিল, তিনি প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব-বলে সরল ও সরস কথায় লোককে মুগ্ধ করিতেন।

কাশীনাথের দ্বিতীয় পুত্র (রামকান্তের প্রপৌত্র) ছকুচন্দ্র চৌধুরী নিজ বুদ্ধিবলে বহু সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্রেরা তাহা ভোগ দখল করিয়া ওকড়সায় বাস করিতেছেন।

কাশীনাথের তৃতীয় পুত্র রমাকান্ত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পদ্মলোচন। ইনি বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে সম্পত্তি করেন। তাঁহার পৌত্র বিশ্বচন্দ্রের সন্তানাদি না থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ সকল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া রাইপুরের সিংহ-বংশধরের বংশধরগণকে বিক্রয় করিয়া আইসেন।

রমাকান্তের দ্বিতীয় পুত্র ধরণীধর—ওরফে—কৃষ্ণপ্রসাদ অতি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ইংরাজ কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি কালেক্টারী পত্তনী প্রভৃতি অনেক সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। সন ১২০৬ সালে মামদানীপুর পরগণার অন্তর্গত লাট পাটুলী ৪২ মৌজা তাঁহার খরিদা। ওকড়সাহা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের যে সকল মহল আছে, তাহা তিনি ইজারা লয়েন। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে বা কালেক্টরীতে তাঁহার দেয় রাজস্বের টাকা অন্য কাহারও অধিকৃত স্থান দিয়া বর্দ্ধমানে যাইত না। ১২২৭ সালে পত্তনী আইনের সৃষ্টি হইলে তাঁহার অনেক সম্পত্তি ইজারার বহির্ভূত হয়। তিনি যে সকল সম্পত্তি বর্দ্ধমান রাজবাটীতে পত্তনী লইয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্দ্ধমান রাজবাটীতে কৃষ্ণপ্রসাদের নামেই প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রসাদের নামে সাগরপুরে ১১॥৶/১৪৮ টাকা ও সুন্দরপুরে ৮॥১০ টাকা জমা আজও প্রচলিত আছে এবং কৃষ্ণনগর প্রাকাশে মুণ্টা গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর নামে ১৩৪৲ টাকা জমা আজও প্রচলিত আছে। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা ভোগ দখল করিতেছেন।

কৃষ্ণপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র—বিষ্ণুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ তনয় গণেশচন্দ্র চৌধুরী ১২৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে যথারীতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহার প্রথম কর্ম্ম মুন্সেফী। শেষ সবজজ হইয়া বহুদিন যশের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কিছুদিনের জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। তিনি যখন



স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র চৌধুরী

চট্টগ্রামে সব্‌জজ ছিলেন, সেই সময় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত তঁহার বন্ধুত্ব হয়। গণেশবাবুর পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও কন্যা পরমেশ্বরী (যাঁহাকে পরম বলিয়া ডাকা হইত) সেই পরমকে কবিবর বড় ভালবাসিতেন এবং 'মা' 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গণেশবাবু একদিন রাত্রিকালে সহসা সপরিবারে কবিবর নবীন সেনের বাসায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের তাৎকালিক প্রাকৃতিক অবস্থা কবিবর কবিতায় বর্ণন করেন। তাহার পাণ্ডুলিপি পরমের কাছে ছিল ও এখনও ইঁহাদের ঘরে যত্নে রক্ষিত আছে। কবির অবকাশ-রঞ্জিনীতে তাহা মুদ্রিত আছে। নবীনবাবু আত্মজীবনচরিতে গণেশ বাবুর সহিত বন্ধুত্বের কথা লিখিতে ভুলেন নাই। কবির উক্ত কবিতাটী —অমূল্য স্মৃতি-রত্ন-বিবেচনায় এখানে না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"নিদ্রার আবেশে নয়ন-পল্লব
 আবরিছে ধীরে নয়ন-তারা ;
গভীরা রজনী, প্রকৃতি নীরব,
 নিদ্রিতা বসুধা চেতন-হারা।
মধুর সঙ্গীত,—বন্ধু-সম্বোধন,—
 পশিল শ্রবণে, ব্যাকুল স্বরে ;
মন উচাটন, বিদ্যুৎ মতন
 ছুটিলাম, সেই স্বর লক্ষ্য ক'রে।

২

পশিনু প্রাঙ্গণে, মরি কি সুন্দর,
 সুন্দর আকাশে সুন্দর শশী ;
ভাসিছে, হাসিছে, প'ড়েছে সুন্দর
 সম্মুখ গিরির উপরে খসি' !

চন্দ্রের কিরণে আকাশের গায়,
শোভে গিরি-শ্রেণী মেঘের মত,
চিত্রিয়া আকাশ তরঙ্গ-রেখায়
শোভে কৃষ্ণ মেঘ ভূতল-নত।

৩

সে রেখা-উপরে, আকাশ-দর্পণ,
শোভে তালচূড়া, আম্রের বন ;
তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রের কিরণে
ছায়ালোক চিত্রে মোহিছে মন।
এ অপ্সরা চিত্র, মরি কি সুন্দর,
নির্জ্জনে প্রকৃতি করিছে ধ্যান ;
নৈশ সমীরণ মৃদুল, মন্থর,
স্রষ্টার প্রশংসা করিছে গান !

৪

চন্দ্রকরে শ্যাম গিরি-কলেবর
হাসে ঝোপে ঝোপে, মলিন হাসি ;
গিরি-কোলে হাসে প্রাঙ্গণ সুন্দর,
প্রাঙ্গণের কোলে কুসুমরাশি।
এক অর্দ্ধ চন্দ্র, বঙ্কিম আকার,
হাসি' হাসি' গিরি-শৃঙ্গেতে দোলে,
এ কি দেখি ! এ কি সম্মুখে আমার !
দুই পূর্ণ চন্দ্র প্রাঙ্গণ-কোলে !

৫

দুই চন্দ্র মাঝে প্রশান্ত মূরতি,
দাঁড়াইয়া সুখে সুহৃদ্বর ;

গৌরকান্তি, সদা সুপ্রসন্ন মতি,
মুখে প্রীতি চিত্ত দয়ার সর।
বালকের মত সরলহৃদয়,
প্রতিবিম্ব তা'র বদনে ভাসে ;
মধুর বচন সরলতাময়
সরলতা সদা নয়নে হাসে।

৬

বালেন্দু মূরতি বালিকা সরলা
অম্লানবদনে দাঁড়ায়ে পাশে ;—
প্রীতির জ্যোৎস্না, পবিত্রা, তরলা,
ভাসে দর্শকের হৃদয়াকাশে।
ভার্য্যা বর্ষীয়সী—না না বলিব না,
ওই দেখ বুড়ী, রাঙ্গায় আঁখি,—
ভার্য্যা বর্ষী—না না—প্রথম-যৌবনা
ঘোমটায় চারু বদন ঢাকি'।

৭

মায়ার মূরতি, প্রেমের প্রতিমা,
সংসার-মরুতে দয়ার লতা ;
পূর্ণ লক্ষ্মী যেন অঙ্গের মহিমা,
স্নেহ-সুধা-মাখা সরল কথা ;
পবিত্রতা-পূর্ণ কোমল-হৃদয়,
নারী-অভিমানে পূরিত বুক,
উজ্জ্বলবরণ পবিত্রতাময়
পবিত্রতা-ভরা প্রসন্ন মুখ।

বহি পবিত্রতা নৈশ সমীরণ,
জুড়ায় জগৎ পাপেতে ভরা ;
অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বিয়া চরণ,
ঝিল্লিরবে স্তুতি করিছে ধরা।
ভক্তি-ভরে শশী প্রসারিয়া কর
আনন্দে প্রণমে পবিত্র পায় :
পবিত্রতা প্রতি পদ-সঞ্চালনে,
সমীরণ-স্রোতে ভাসিয়া যায়।

পবিত্রতা-স্রোতে ভরিল হৃদয়,
বলিনু পবিত্র চরণে ধরি ;—
'এসো এসো, দেবি, দীনের আলয়,
ও পদ পরশে পবিত্র করি।
তুমি মহালক্ষ্মী, দীনহীন আমি,
স্বর্গাসন কোথা পাইব বল ?
ভক্তির আসনে চরণ দুখানি
রাখ, পূজি দিয়া নয়ন-জল।'

১০

'এসো, মা,'—কহিনু চাহি বালিকায়,—
এসো, মা, তোমার ছেলের ঘরে ;
বুঝিলাম, ভালবাস, মা, আমায়,
আসিও যে বাসি পরাণ ভ'রে।

সোণার পুতুলী, আদর-লহরী,
কেন মা, দাঁড়িয়ে ভূতলে, বল ?
নন্দনের ফুল কেন গড়াগড়ি
প্রাঙ্গণে, বল, মা, ঘরেতে চল !”

কবিবর ‘আমার জীবন’ নামক পুস্তকের অনেক স্থলে গণেশবাবুর সহিত বন্ধুতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের শেষাংশ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটুকু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

“আমার বদলীর সম্বন্ধে দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কত লোকই দেখা করিতে আসিয়াছিল। আমার আহার-নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল। একটী বন্ধুর কথা এখানে বলিব। বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী তখন চট্টগ্রামের সবজজ। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহার দশ বছরের মেয়েকে আমি ‘মা’ বলিয়া ডাকিতাম। সে এবং তাহার মা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহারা তিনটীতে জিদ করিয়া বসিলেন যে,—আমি কলিকাতা গেলে স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতএব স্ত্রীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কারণ আমাদের দুজনকে আবার একত্র না দেখিলে, আবার আমাদিগকে লইয়া দুদিন আমোদ-আহ্লাদ না করিলে তাঁহাদের সে দুঃখ যাইবে না। স্ত্রী আসিলেন এবং দুটী দিন তাঁহাদের অতিথি হইয়া কি আনন্দেই কাটাইলাম !”

বিখ্যাত ব্যারিষ্টার W. C. Bonnerjeeর পিসতুত ভ্রাতা পরেশ-নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমেশ্বরীর বিবাহ হয়। পরেশনাথ সবজজ হইয়া ছিলেন। ১২৯৪ সালে গণেশচন্দ্রের মেদিনীপুরে সবজজ থাকা কালে পরমেশ্বরী এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মেদিনী-

পুরের গঙ্গারাম দত্তের কুঠী বাড়ীতে পরলোক গমন করেন। পরেশনাথ তখন সীতাকুণ্ডের মুন্সেফ। ঐ বাড়ী এক্ষণে সূর্য্যকুমার অগস্তির হইয়াছে।

১৮৯০ খৃঃ অঃ কৃষ্ণনগর হইতে গণেশচন্দ্র পেন্‌শন্ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৯১ খৃঃ অঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র পূর্ণচন্দ্র তিনটী কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। পুত্র-বিয়োগ-বিধুর গণেশচন্দ্র তখন সর্ব্ববিষয়ে ভগ্নাশ ভগ্নোদ্যম হইয়া কাশীবাস করেন। তথায় কিছুদিন বাস করিয়া কাটোয়ার নিকট ঘোষহাটে—গঙ্গাতীরে এক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া সেইস্থানে অবস্থিতি করেন। সন ১৩০১ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখ এই গঙ্গাতীরে উপরত হন। গণেশচন্দ্র তিন সহোদর ও দুই বৈমাত্রেয়। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের তিনি সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সাধারণ লোকে সহোদর বলিয়াই জানিত। বৈমাত্রেয় মথুরানাথ ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাটোয়া কোর্টে যশের সহিত অনেক দিন ওকালতি করেন এবং অনেক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার ও নূতন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া কাটোয়াধামে বিসূচিকা রোগে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

মধ্যম নীলমাধব, পিতা বর্ত্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কনিষ্ঠ আশুতোষ সন ১৩১৩ সালে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ইঁহাদের দুই ভ্রাতার ভ্রাতৃ-ভাব বড়ই সুন্দর ও সুখকর ছিল। দুটী ভিন্ন দেহ,—এক প্রাণ! তাঁহারা জীবিত থাকিতে কেহ পৃথকান্ন হন নাই। আশুতোষের যখন প্রৌঢ়াবস্থা, তখন তাঁহার অনেকগুলি জমীদারী, অনেক টাকার মহাজনী ও চারিটী নীলকুঠির কাজ চলিতেছিল। তিনি অক্লিষ্টভাবে পরিশ্রম করিয়া যাবতীয় বিষয়-কর্ম্ম স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ নহে, হাতে কলমে খাটিতেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি বড় সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও চমৎকার



স্বৰ্গীয় আশুতোষ চৌধুরী।

ছিল। তিনিও অনেক বিষয় বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি জলাশয় খনন করাইয়া বহুলোকের শুভসাধন করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহারা দুই সহোদরে মিলিয়া ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে নিজগ্রাম ওকড়সাহায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। কালক্রমে ঐ স্কুলের অবস্থা হীন হওয়ায় উহা মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়। ইং ১৮৯৭ সালে পুনরায় ঐ স্কুল উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়। স্কুলের পরিচালক শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ চৌধুরী এই বংশের বর্ত্তমান উজ্জ্বল রত্ন এবং গৌরবস্থল। তিনি সহৃদয়, অমায়িক, দেশহিতৈষী, দরিদ্র-প্রতিপালক এবং বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টা, অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহের ফলে এই স্কুল পুনরায় সংস্থাপিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া জেলার মধ্যে একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। দূরবর্ত্তী স্থানের ছাত্রগণের বসবাসের সুবিধার জন্য গোরাচাঁদবাবু বহুব্যয়ে একটী ছাত্রবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে বিভিন্ন স্থানের বহু ছাত্র বাস করিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। বিদ্যালয়গৃহ ও ছাত্রবাস-নির্ম্মাণকল্পে সহৃদয় গোরাচাঁদ বাবু প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। অধিকন্তু অনেক দরিদ্র বালককে ছাত্রাবাসের ব্যয় সরবরাহ করিয়া এবং বিদ্যালয়ের বেতন পর্য্যন্ত দিয়া তাহাদের বিদ্যা-শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। এরূপে বহু ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগে ক্রমশঃ কৃতবিদ্য হইয়া জীবনে উন্নতি-লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও আরও অনেকে হইবেন। তাঁহারা গোরচাঁদবাবুর কীর্ত্তির এক একটী উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, তাহার পুষ্টিসাধন ও সংরক্ষণ-ব্যাপারে বেশ বুঝা যায়, ভবিষদ্দৃষ্টি ও লক্ষ্যপথে অক্লান্তভাবে দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা ও ধৈর্য্যসহকারে অগ্রসর হইবার শক্তি গোরাচাঁদবাবুর চরিত্রের একটী বিশেষত্ব।

বস্তুতঃ গোরাচাঁদবাবুর ন্যায় উচ্চহৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ জমিদার

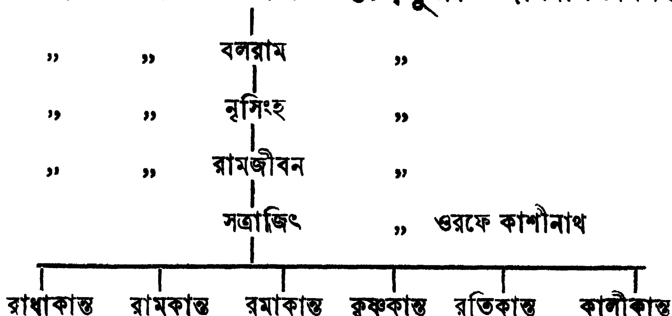
বিরল। অধীন প্রজাবর্গের, গ্রামবাসিগণের এবং দেশবাসীর উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। তাঁহার যত্নে গ্রামে পোষ্ট অফিস, বোর্ড বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৫৫ বৎসর। বাল্যকাল অবধি জ্যেষ্ঠতাত গণেশবাবুর সহিত বসবাস করায় তাঁহার প্রভাবে, উন্নত আদর্শে গোরাচাঁদবাবুর চরিত্র বাল্যকাল হইতে সুমার্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন। যৌবনে চক্ষুপীড়ার জন্য লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হওয়ায় তাদৃশ উচ্চশিক্ষা-লাভে সমর্থ না হইলেও বংশের পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তিনি উচ্চশিক্ষার যাবতীয় সুফল লাভ করিয়াছেন। ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার, অমায়িক ও সদালাপী ব্যক্তি বাস্তবিকই পল্লীগ্রামে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

'আত্মনঃ জায়তে পুত্রঃ' কাজেই পিতার সদ্‌গুণ পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া যায় না। অতএব দেখা যায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কমলাপতি চৌধুরী বি-এ দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিমলাপতি চৌধুরী উভয়েই ন্যায়বান্, সদালাপী, উচ্চহৃদয়, উৎসাহসম্পন্ন ও সহাস্যবদন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যে বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন, ইহার যথেষ্ট ভরসা করা যায়।

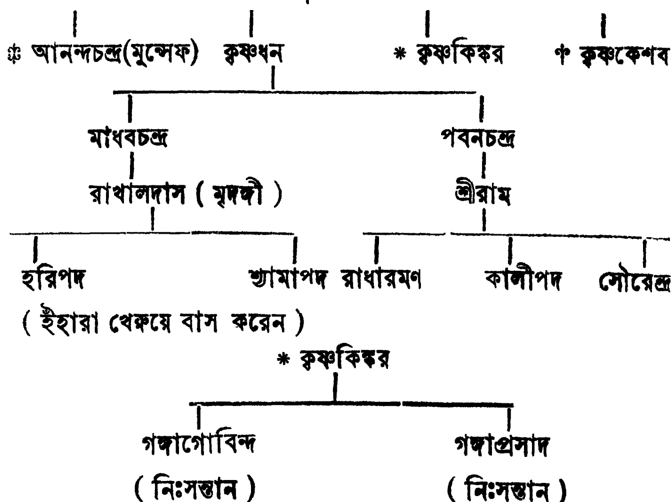


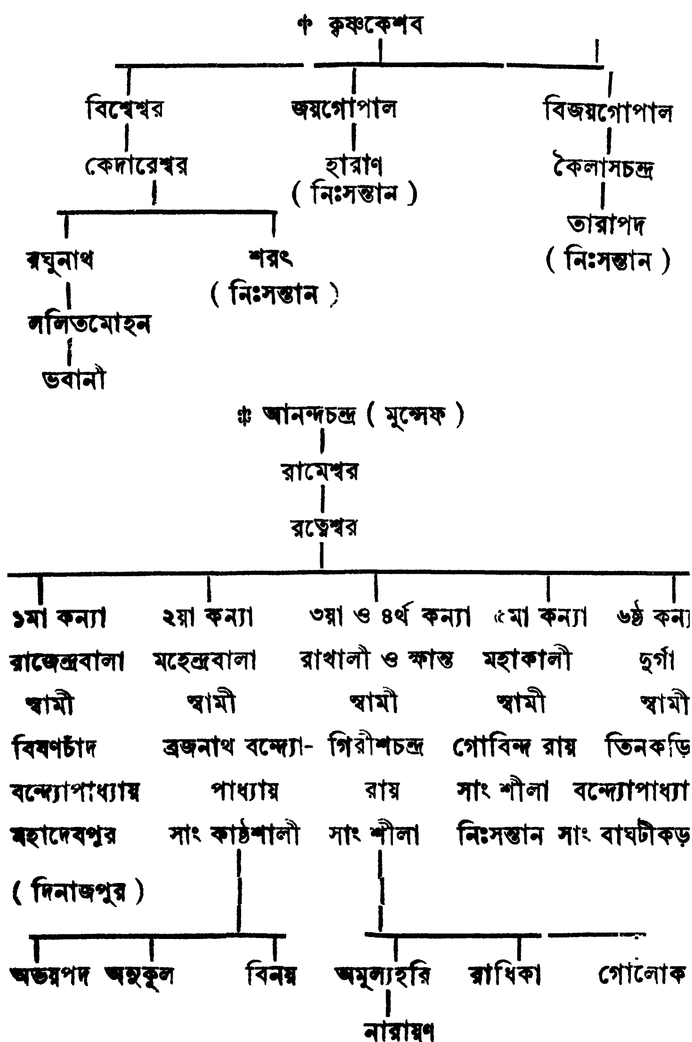
শ্রীযুক্ত বাবু গোরাচাঁদ চৌধুরী

রাজা রায় পরমানন্দ চৌধুরী—(নিবাস চাকদহ)

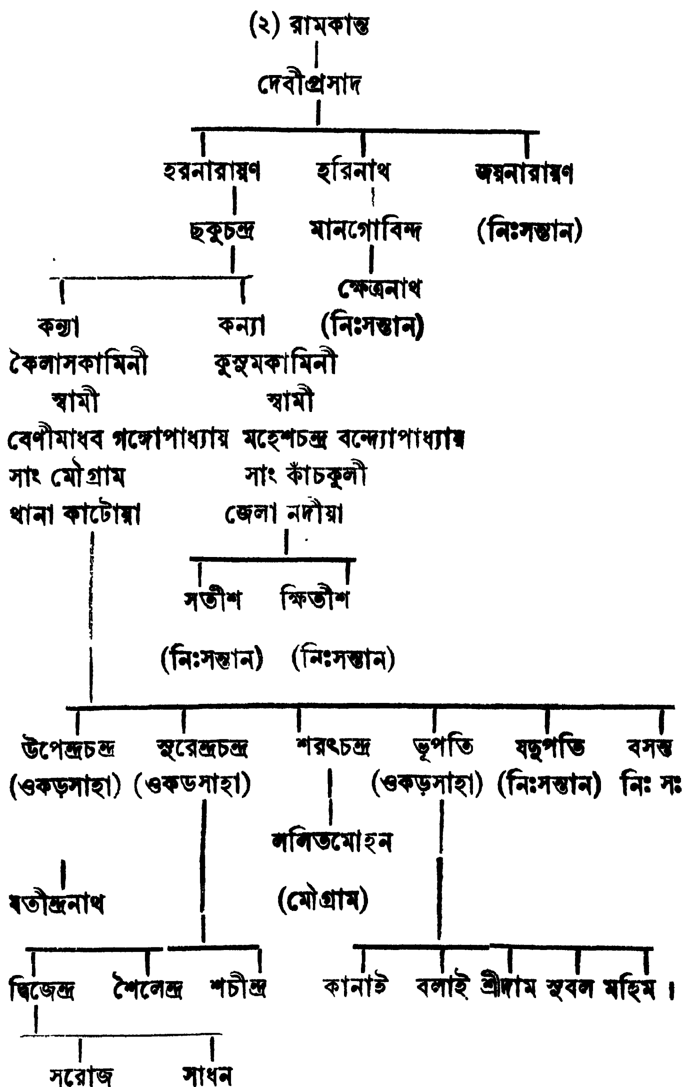


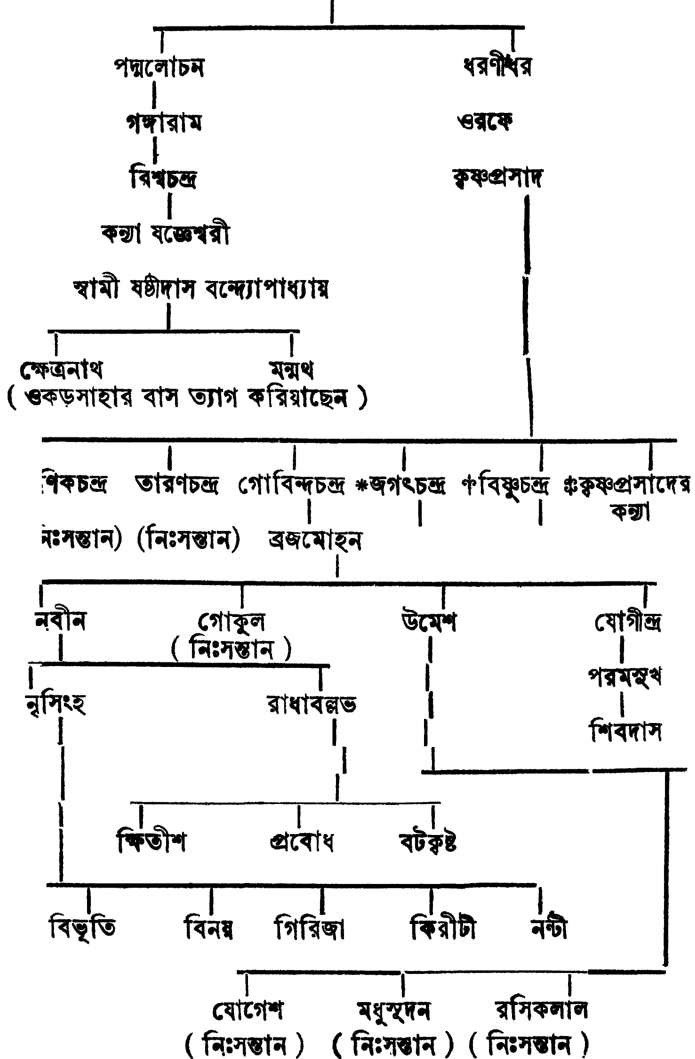
(১) রাধাকান্ত

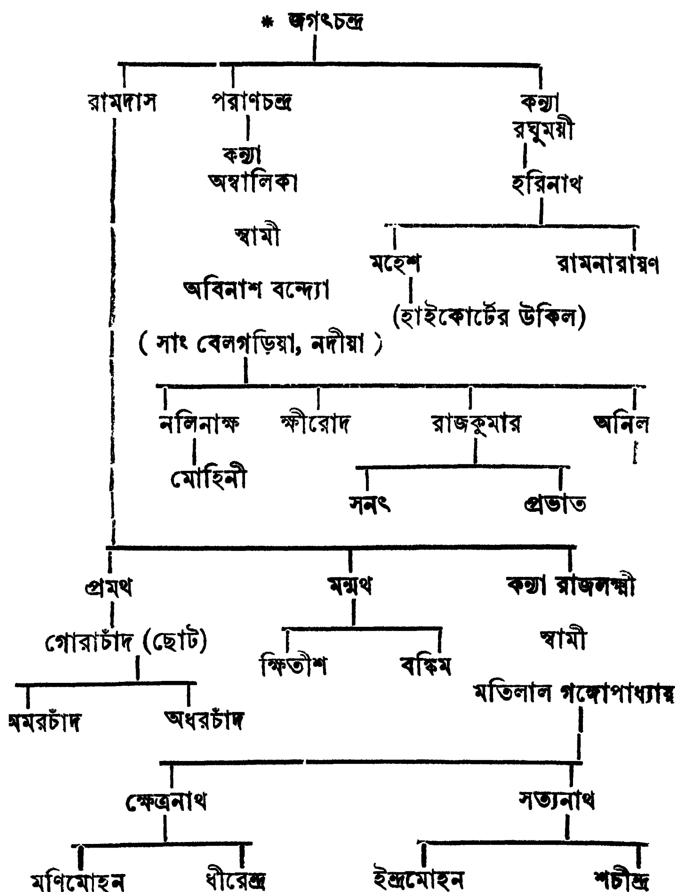


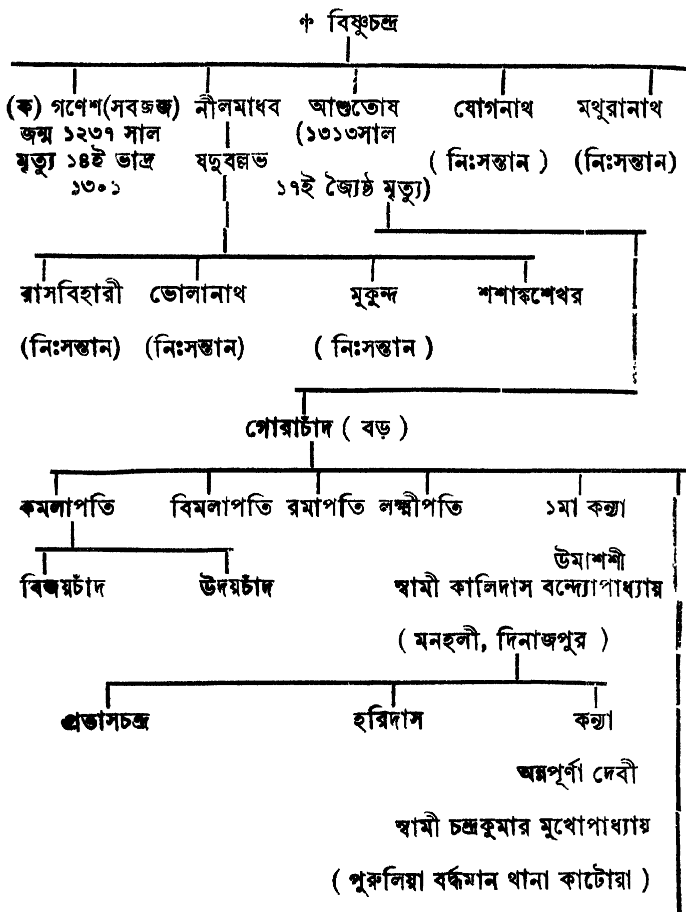


ক কৃষ্ণকেশব
বিশ্বেশ্বর
জয়গোপাল
বিজয়গোপাল
কেদারেশ্বর
হারাণ
(নিঃসন্তান)
কৈলাসচন্দ্র
তারাপদ
(নিঃসন্তান)
রঘুনাথ
শরৎ
(নিঃসন্তান)
ললিতমোহন
ভবানী
খ আনন্দচন্দ্র (মুন্সেফ)
রামেশ্বর
রত্নেশ্বর
১মা কন্যা
রাজেন্দ্রবালা
স্বামী
বিষণচাঁদ
বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাদেবপুর
(দিনাজপুর)
২য়া কন্যা
মহেন্দ্রবালা
স্বামী
ব্রজনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায়
সাং কাষ্ঠশালী
৩য়া ও ৪র্থ কন্যা
রাখালী ও ক্ষান্ত
স্বামী
গিরীশচন্দ্র
রায়
সাং শীলা
৫মা কন্যা
মহাকালী
স্বামী
গোবিন্দ রায়
সাং শীলা
নিঃসন্তান
৬ষ্ঠ কন্যা
দুর্গা
স্বামী
তিনকড়ি
বন্দ্যোপাধ্যা
সাং বাঘটীকড়
অভয়পদ
অনুকূল
বিনয়
অমূল্যহরি
রাধিকা
গোলোক
নারায়ণ


(২) রামকান্ত
দেবীপ্রসাদ
হরনারায়ণ
হরিনাথ
জয়নারায়ণ
ছকুচন্দ্র
মানগোবিন্দ
(নিঃসন্তান)
ক্ষেত্রনাথ
কন্যা
কন্যা
(নিঃসন্তান)
কৈলাসকামিনী
কুসুমকামিনী
স্বামী
স্বামী
বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং মৌগ্রাম
সাং কাঁচকুলী
থানা কাটোয়া
জেলা নদীয়া
সতীশ
ক্ষিতীশ
(নিঃসন্তান)
(নিঃসন্তান)
উপেন্দ্রচন্দ্র
সুরেন্দ্রচন্দ্র
শরৎচন্দ্র
ভূপতি
যদুপতি
বসন্ত
(ওকড়সাহা)
(ওকড়সাহা)
(ওকড়সাহা)
(নিঃসন্তান)
নিঃ সঃ
ললিতমোহন
(মৌগ্রাম)
যতীন্দ্রনাথ
দ্বিজেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
শচীন্দ্র
কানাই
বলাই
শ্রীদাম
সুবল
মহিম।
সরোজ
সাধন


(৩) রমাকান্ত
পদ্মলোচন
ধরণীধর
গঙ্গারাম
ওরফে
বিশ্বচন্দ্র
কৃষ্ণপ্রসাদ
কন্যা যজ্ঞেশ্বরী
স্বামী ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্ষেত্রনাথ
মন্মথ
(গুকড়সাহার বাস ত্যাগ করিয়াছেন)
িকচন্দ্র
তারণচন্দ্র
গোবিন্দচন্দ্র
*জগৎচন্দ্র
†বিষ্ণুচন্দ্র
‡কৃষ্ণপ্রসাদের কন্যা
নিঃসন্তান)
(নিঃসন্তান)
ব্রজমোহন
নবীন
গোকুল
(নিঃসন্তান)
উমেশ
যোগীন্দ্র
পরমসুখ
শিবদাস
নৃসিংহ
রাধাবল্লভ
ক্ষিতীশ
প্রবোধ
বটকৃষ্ট
বিভূতি
বিনয়
গিরিজা
কিরীটী
নন্টী
যোগেশ
(নিঃসন্তান)
মধুসূদন
(নিঃসন্তান)
রসিকলাল
(নিঃসন্তান)


* জগৎচন্দ্র
রামদাস
পরাণচন্দ্র
কন্যা
রঘুময়ী
কন্যা
অম্বালিকা
হরিনাথ
স্বামী
মহেশ
রামনারায়ণ
অবিনাশ বন্দ্যো
(হাইকোর্টের উকিল)
(সাং বেলগড়িয়া, নদীয়া)
নলিনাক্ষ
ক্ষীরোদ
রাজকুমার
অনিল
মোহিনী
সনৎ
প্রভাত
প্রমথ
মন্মথ
কন্যা রাজলক্ষ্মী
গোরাচাঁদ (ছোট)
স্বামী
ক্ষিতীশ
বঙ্কিম
মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অমরচাঁদ
অধরচাঁদ
ক্ষেত্রনাথ
সত্যনাথ
মণিমোহন
ধীরেন্দ্র
ইন্দ্রমোহন
শচীন্দ্র


৮ বিষ্ণুচন্দ্র
(ক) গণেশ(সবজজ)
জন্ম ১২৩৭ সাল
মৃত্যু ১৪ই ভাদ্র
১৩০১
নীলমাধব
যদুবল্লভ
আশুতোষ
(১৩১৩সাল
১৭ই জ্যৈষ্ঠ মৃত্যু)
যোগনাথ
(নিঃসন্তান)
মথুরানাথ
(নিঃসন্তান)
রাসবিহারী
(নিঃসন্তান)
ভোলানাথ
(নিঃসন্তান)
মুকুন্দ
(নিঃসন্তান)
শশাঙ্কশেখর
গোরাচাঁদ (বড়)
কমলাপতি
বিমলাপতি
রমাপতি
লক্ষ্মীপতি
১মা কন্যা
উমাশশী
স্বামী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(মনহলী, দিনাজপুর)
বিজয়চাঁদ
উদয়চাঁদ
প্রভাসচন্দ্র
হরিদাস
কন্যা
অন্নপূর্ণা দেবী
স্বামী চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
(পুরুলিয়া বর্দ্ধমান থানা কাটোয়া)

গোরাচাঁদ (বড়)

২য়া কন্যা	৩য়া কন্যা	৪র্থা কন্যা	৫ম কন্যা	৬ষ্ঠা কন্যা	৭মা কন্যা
প্রভাশশী	সুধাশশী	প্রমীলা	ফুরু	ঝুনু	অনুপমা
স্বামী রমণী চট্টোপাধ্যায় দেওয়াসীন, বৰ্দ্ধমান	স্বাঃ গোপীনাথ রায় কৃষ্ণনগর চাঁদসরক)	স্বাঃ দেবেন্দ্র নাথ রায় সাং চুপী	(বাল্যাবস্থায় মৃত্যু)	(বাল্যবস্থায় মৃত্যু)	স্বামী ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মনহলী, দিনাজপুর
কন্যা তিলোত্তমা					

(ক) গণেশ (সবজজ)

পূর্ণচন্দ্র	কালীপদ	কন্যা	কন্যা পরমেশ্বরী
মৃত্যু ২রা পৌষ ১২৯৭	(নিঃসন্তান) (কুমিল্লা যাইবার কালীন মেঘনা নদীতে নৌকায় জরে মারা যান)	গোকুলেশ্বরী (নিঃসন্তান)	১২৯৩ সালে বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরে মৃত্যু স্বামী পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় (সবজজ) বিল্বগ্রাম, নদীয়া ৯এ রামতনু বোসের লেন

উষাবতী
স্বামী
নিশানাথ রায়
(কৃষ্ণনগর চাঁদসরক)

সুরেন্দ্রবালা
স্বামী প্রফুল্লকুমার বন্দ্যো।
বেলগড়িয়া নদীয়া,
হাল মোঃ ৬নং পান-
বাজার, খিদিরপুর

চারুবালা
স্বামী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।
সাং বেলেশিকড়া, জেলা
হুগলী, হাল ১৬১নং
বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উষাবতী — শিবানাথ, কালীনাথ, হরনাথ

সুরেন্দ্রবালা — ক্ষিতীশ, সতীশ, যতীশ, শ্রীশ

চারুবালা — মণীন্দ্র

গৌরভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি-এল এটর্ণী
(৯এ রামতনু বসুর লেন
কলিকাতা।

কন্যা ক্ষেত্রমণি দেবী
স্বামী শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়
বি,এল সাং জয়রামপুর (নদীয়া)

ক্ষেত্রমণি দেবী — প্রদ্যোতকুমার, সরোজকুমার

গৌরভূষণ — চিত্তরঞ্জন, নিত্যরঞ্জন, অনিলকুমার, সুশীল, সুবোধ, সুধী

৫ কৃষ্ণপ্রসাদের কন্যা
অম্বিকাদেবী
স্বামী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
গয়ঘর, রত্নেশ্বর

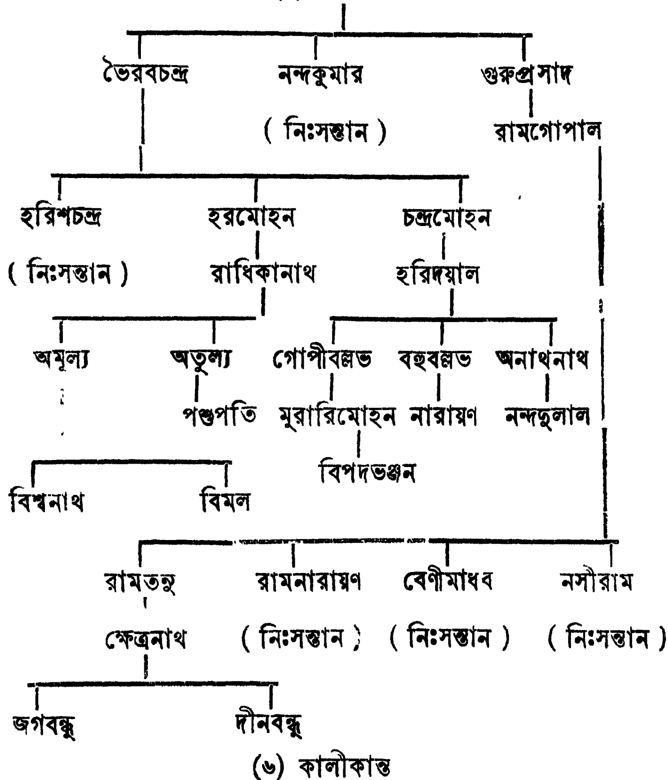
অম্বিকাদেবী — দুর্গাদাস, কালিদাস

দুর্গাদাস — শ্রীধর, উমাকান্ত, মৃত্যুঞ্জয়

কালিদাস — শ্যামচাঁদ

(৪) কৃষ্ণকান্ত

(৫) রতিকান্ত



(৬) কালীকান্ত

৺দুর্গাপ্রসাদ সেন।

বাঙ্গালা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাঁহারা লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ-গৌরবের পুনরুদ্ধারকল্পে বিপুল পরিশ্রম ও অসাধারণ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন, স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ সেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ় দুর্গা-প্রসাদ স্বীয় মাতৃভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত করমপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যসমাজের কুলগ্রন্থে তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশকে গয়ীসেন বংশ বলে। ঐ বংশীয়দিগের গোত্র ধন্বন্তরি বলিয়া সুপরিচিত। চিকিৎসাকার্য্যে দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। কলিকাতা কুমারটুলীর কবিরাজ-সম্প্রদায়ের গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, নিশিকান্ত ও বিজয়রত্ন প্রসিদ্ধ চারিটী স্তম্ভবিশেষ। এই চারিটী স্তম্ভের উপর যে সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে, কালের সর্ব্বসংহারক প্রভাবও শীঘ্র তাহার বিলোপ-সাধনে সমর্থ হইবে না। কলিকাতা কুমারটুলীর কবিরাজ-সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয়। নীলাম্বর ঢাকা নগরীতে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং ঐ স্থানে স্বকার্য্যে তাহার প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। গণি মিঞার ঘড়ী, নীলাম্বরের বড়ী প্রভৃতি সে সময়ের ঢাকার প্রবাদবাক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। নীলাম্বর যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য ছিলেন। তদানীন্তন পূর্ব্ববঙ্গের ঋষিকল্প বৈদ্যাচার্য্য বরিশালান্তর্গত গৈলাগ্রাম-নিবাসী স্বনামধন্য মদন কবীন্দ্র নীলাম্বরের অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যয়নাবস্থায় নীলাম্বর গুরুর নিকট যাবতীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন

করিয়াছিলেন। স্বপাকভোজন ও তাহার আনুসঙ্গিক কর্ম্ম, পুস্তক-লিখন প্রভৃতি বহু আয়াসসাধ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহার ফলে তিনি পরবর্ত্তীকালে সুবিদ্বান্ ও সুচিকিৎসকরূপে প্রভূত যশঃ উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নীলাম্বরের পিতা হরিনারায়ণও চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, অধিকন্তু তিনি বৈষয়িক কার্য্যে অতি নিপুণ ছিলেন। তাঁহার শেষোক্ত গুণে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন নবাব-আখ্যাধারী কোনও মুসলমান জমিদার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সাদরে দেওয়ানী প্রদান করেন। দেওয়ান হরিনারায়ণ স্বীয় প্রভুর পারবারস্থ কোনও বিধবা রমণী নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাহার গূঢ়োৎপন্ন গর্ভ নির্ণয় করেন এবং এই সংবাদ অচিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ৺হরিনারায়ণই এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সন্দেহে নবাব উপযুক্ত শ্রদ্ধাভাজন দেওয়ানের প্রতি সেই সময়ে প্রচলিত নানাবিধ কঠোর ও নিষ্ঠুর দণ্ডের বিধান না করিয়া কেবল তাঁহাকে দেওয়ান-পদ হইতে চ্যুত করেন। পিতার পদচ্যুতির সময়ে নীলাম্বরের পাঠ্যাবস্থা। তখন তিনি গৈলাগ্রামে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলাম্বরের ভাগ্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

নীলাম্বর যখন বৃদ্ধ তখনও তাঁহার মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। বৃদ্ধকালে গঙ্গাতীরে বাস করিবার উদ্দেশ্যে ও যাহাতে মাতৃদেবীর গঙ্গা-প্রাপ্তি ঘটে—এই কামনায় শেষ বয়সে নীলাম্বর ঢাকানগরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক কুমারটুলিতে বাস করিতে থাকেন ও অল্পদিন মধ্যে কলিকাতায়ও সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ সেন স্বগ্রামে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের জন্মের একাদশ দিবসে তাহার গর্ভ-ধারিণীর পরলোক-গমন হয়। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সোনারঙ্গ-

নিবাসী ৺দীনবন্ধু সেন কবিরাজ মহাশয়ের মাতাই তাঁহাকে স্তন্যাদি প্রদান করিয়া জীবিত রাখেন, পরে নীলাম্বর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীই দরজিপাড়ার বিখ্যাত ও সুপণ্ডিত কবিরাজ অন্নপ্রসাদের জননী। এই রমণী অতিমাত্র স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষাও সমধিক যত্নের সহিত দুর্গাপ্রসাদের লালন-পালন করেন। শৈশব হইতেই দুর্গাপ্রসাদ প্রতিভাশালী ছিলেন। বালকের অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া নীলাম্বরের জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাকে সেই সময়ে নবপ্রচলিত ইংরেজী পড়াইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ বৃদ্ধ নীলাম্বর আত্মীয়ের বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে দেন। দুর্গাপ্রসাদ বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর স্বগ্রামবাসী পণ্ডিতপ্রবর ৺রাজদুর্ল্লভ শিরোমণির নিকট টীকা পঞ্জী কবিরাজ ও বাদার্থ-সমেত সম্পূর্ণ কলাপ ব্যাকরণ ও ৺কালীকান্ত শিরোমণির নিকট সাহিত্য-দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি সোনারঙ্গ-নিবাসী প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কালিদাস গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কলিকাতায় বৃদ্ধাজননীর সম্মুখেই নীলাম্বর স্বর্গারূঢ় হন এবং বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি গঙ্গাপ্রসাদ পৈতৃক আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদকে লইয়া চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হন। দুর্গাপ্রসাদ সহকারীভাবে অগ্রজের সহিত চিকিৎসাকার্য্য করিতে থাকেন ও উক্ত কার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে নবাগত বৈদেশিক ভাষার প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। বৈদেশিক বিদ্যার অনুরাগীদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ দিন দিন উপেক্ষিত হইয়া হতগৌরব ও ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। আয়ুর্ব্বেদের যখন এই অবস্থা তখন বিধাতৃপুরুষ আয়ুর্ব্বেদ-রক্ষার মানসে তিনটী দিক্‌পালস্বরূপ মানব প্রেরণ করেন। মুর্শিদাবাদে সর্ব্বশাস্ত্রে

বিচক্ষণ অজেয় পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয় নানাশাস্ত্রের সংস্কার-কল্পে মূলগ্রন্থ, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদির বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাদি প্রণয়ন দ্বারা যুগান্তর উপস্থিত করেন ও বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ছাত্রকে শিক্ষাদানপূর্ব্বক ভবিষ্যতে আয়ুর্ব্বেদ-গৌরবরক্ষার পথ উদ্ভাবন করেন। এদিকে গঙ্গাপ্রসাদ সেন অনুজ দুর্গাপ্রসাদকে লইয়া ভারতের রাজধানীতে বসিয়া পাশ্চাত্য শাস্ত্রানু-সারে চিকিৎসকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সহস্র সহস্র দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করিতে লাগিলেন।

দুর্গাপ্রসাদের বয়স যখন আনুমানিক ২৪।২৫ বৎসর, তখন তিনি দুরারোগ্য সর্ব্বাঙ্গগত বাতব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তিনি বাকৃশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, এমন কি কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার বিলুপ্ত হইয়া ছিল; দেশীয় ও বিদেশীয় আট নয় বৎসরব্যাপী নানাবিধ চিকিৎ-সাদির পর ব্যর্থমনোরথ ও নিরাশ হইয়া তিনি দৈবানুগ্রহ-প্রত্যাশী হইয়া ভগবান ভবানীপতির শরণ গ্রহণ করেন ও অচিরে ৺তারকেশ্বরের স্বপ্নাদেশক্রমে তাঁহার পায়স-প্রসাদ ও ব্রাহ্মণের পদরজঃ ভক্ষণপূর্ব্বক এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই ঘটনায় যৌবনেই দুর্গাপ্রসাদের চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখী হইয়াছিল এবং দৈববলাপেক্ষা যে আর বলবত্তর কিছুই নাই সে বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। ব্যবহার-ক্ষেত্রেও সহস্র সহস্র রোগী চিকিৎসার সময়ে তিনি ভেষজের অসাধ্য রোগ-বিনাশের জন্য বরং ঈশ্বরের শরণ লইতেন ও রোগী-দিগকেও তদনুযায়ী উপদেশ দিতেন। দৈবানুগ্রহে চিকিৎসা-ব্যাপারে অলৌকিক ও সূক্ষ্ম বিষয়-দর্শনে তাঁহার অসাধারণ শক্তি জন্মিয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইলে রাণী রাসমণির পরামর্শে

পরমহংসদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাপ্রসাদের নিকট আগমন করেন। গঙ্গাপ্রসাদ উন্মাদের চিকিৎসোপযোগী তৈল ঘৃতাদির যখন ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন দুর্গাপ্রসাদই জ্যেষ্ঠকে পরমহংসদেবের সাধকোচিত ভাব সূক্ষ্মরূপে প্রণিধান করিয়া ভেষজের অসাধ্য ও অচিকিৎস্য ঐ দিব্যোন্মাদের বিষয় তাঁহাকে অবগত করান। সে সময়ে অনুজের পরামর্শ উপেক্ষিত হইলেও পরে জ্যেষ্ঠকে বাধ্য হইয়া কনিষ্ঠের মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনেক রোগীর চিকিৎসায়ই দুর্গাপ্রসাদের এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুর্গা-প্রসাদের ভারত-বিখ্যাত-কীর্ত্তি মহামহোপাধ্যায়কল্প পুত্র নিশিকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হইলে সংসারে গৃহবিবাদের সূত্র লক্ষ্য করিয়া ভ্রাতৃস্নেহপ্রবণ-হৃদয় গঙ্গাপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদকে পৃথক্ বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন ও সেই স্থানেই পৃথক্‌ভাবে সপুত্র বাস করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তদবধি তিনি নূতন বাড়ীতে আগমন করিয়া সপুত্র চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিচালনা করিতে থাকেন। তদানীন্তন চিকিৎসকদিগের শিরোমণিভূত পুত্র নিশিকান্তের উপর প্রধানতঃ ব্যবসায় ও ছাত্রাদি অধ্যাপনার ভার প্রদান করিয়া তিনি যখন ভগবৎ-প্রসঙ্গে সমস্ত জীবন যাপন করিবার অভিলাষ করিতেছিলেন, তখন ১৩১১ অব্দের মহাপূজার কিছুপূর্ব্বে তরুণ বয়সে নিশিকান্ত স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই নিশিকান্তের বিদ্যাবত্তা ও চিকিৎসানৈপুণ্য ভারত অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের পরপারে পৌছিয়াছিল। যে অল্পকাল তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই তিনি বিপুল অর্থ আয় করিয়া স্বীয় বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ের মধ্যেই তাঁহার শত শত কৃতবিদ্য ছাত্র বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে গমন করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আত্মানুরূপ যুবক জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধুভূষণের অকালে লোকান্তর গমনই একরূপ

নিশিকান্তের মৃত্যুর কারণ। যাহা হউক, পুত্রের মৃত্যুর পর ভগবানের বিধানে চিরতুষ্ট ভগবদ্‌ভক্ত দুর্গাপ্রসাদ অসীম ধৈর্য্যের সহিত শোক দমন করিয়া পৌত্র কালীভূষণকে আয়ুর্ব্বেদাদি শিক্ষাদান ও তাঁহাকে লইয়া ব্যবসায়-পরিচালনে মনোনিবেশ করেন এবং অবশেষে স্নেহভাজন পৌত্রকে কৃতবিদ্য সুচিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত দেখিয়া ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ৩০শে ফাল্গুন প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে সজ্ঞানে তনু ত্যাগ করেন। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি সুস্থ ছিলেন। আপনার মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি নিজেই সকলকে ডাকিয়া আপনার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চারিদিকে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত গঙ্গাজলে আবক্ষ-নিমগ্ন, এই অবস্থায় ভগবানের নাম করিতে করিতে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ৺কাশীধাম ও ৺বৈদ্যনাথধামে গৃহ ও শিবালয় প্রতিষ্ঠাদি নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। প্রত্যহ বহুসংখ্যক নানা জাতীয় লোক ও ছাত্র তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত। কত লোক যে তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পরের উপকার করিতে তাঁহার দেশকালপাত্র বিবেচনা ছিল না। দুর্গা-প্রসাদের চরিত্রে যেরূপ দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, নিরভিমানতা, নিরহঙ্কারিতা, বিনয় ও সরলতা লক্ষিত হইত, বিংশ শতাব্দীতে তাহার অনুরূপ নিদর্শন সর্ব্বথা দুর্ল্লভ। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য চিকিৎ-সকের যে আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার আর পুনরাবির্ভাবের আশা নাই। ঔষধ ও রোগীকে সাহায্য-বিতরণে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থগৃধ্নুতা তাঁহার মোটেই ছিল না। যে পরিমাণ ঔষধ তাঁহার ঔষধালয়ে বিক্রীত হইত, অন্ততঃ তাহার দশগুণ কিংবা অধিক দরিদ্রদিগকে বিতরণ করা হইত।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে "নায়ক" পত্রিকায় বৈদ্যসমাজের ভীষ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, বদান্যতা প্রভৃতি গুণগ্রাম লক্ষ্য করিয়া বাস্তবিক তাঁহাকে ভীষ্ম ব্যতীত অন্য কোনও সাধারণ মানবের সহিত উপমিত করা চলে না। ভীষ্ম সর্ব্বথা তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ ও উপমার স্থল। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টা শিশুর ন্যায় বিহ্বল হইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ উপভোগ করিতেন। চিকিৎসকরূপে দুর্গাপ্রসাদের নাম চিরদিন তাঁহার অগ্রজ গঙ্গাপ্রসাদ, পুত্র নিশিকান্ত ও ভাগিনেয় বিজয়রত্নের সহিত কীর্ত্তিত হইবে এবং উন্নত-চেতা ভগবদ্ভক্ত নিরহঙ্কার পরোপকারী করুণহৃদয় মানবরূপে তিনি চিরদিন মানবসমাজের পূজা লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পৌত্র ও তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষা-বলে কৃতী বৈদ্যশিরোমণি নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের পুত্র সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিরত্ন মহাশয় সকল বিষয়ে পিতৃপিতামহের পন্থার অনুসরণ করিয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী আছেন।

কবিরাজ কালীভূষণের তিন পুত্র—শ্রীমান্ নলিনীকান্ত, শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ ও শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ।

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গৌরীপুর জমিদার-বংশের—কেবল গৌরীপুর জমিদার-বংশের কেন—সমগ্র দেশের গৌরব ও অলঙ্কারস্বরূপ। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের রায়চৌধুরী-উপাধিক জমিদার-বংশ কাশ্যপগোত্রজ মৈত্রকুলোদ্ভূত। সিন্ধু ওঝা কাশ্যপ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী সুষেণ হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ। সিন্ধু ওঝার দুই পুত্র—ক্রতু ও মতু। মতুর অধস্তন বৃহস্পতির দুই পুত্র, তাঁহাদের নাম—সোল ওঝা ও কূপ ওঝা।

গৌরীপুর-জমিদার-বংশ —আদি-বিবরণ

সোল ওঝার তিন পুত্র—মাধব, কেশব ও অম্বর। মাধবের বংশ-ধরগণ মিতড়ার ভট্টাচার্য্য-বংশ; কেশব স্বীয় বাসস্থান আঙ্গোরা গ্রামে "আঙ্গোরা-সমাজ" নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বরের বংশধরগণ হরিপুরের চৌধুরী-বংশ।

কেশব ওঝার পুত্র জীব ওঝা। ইনি উদয়নাচার্য্যের প্রথম পক্ষের ত্যাজ্য পুত্র চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারকরণে" যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া কৌলীন্যচ্যুত হন। পরে ইঁহার বংশধরগণ তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিক্রমে শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া শ্রোত্রিয় হন।

জীব ওঝার প্রপৌত্র শ্রীনিবাস। তাঁহার এক পুত্র দিবাকর নাটোর রাজবংশের এবং অপর পুত্র রামশরণ ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর প্রভৃতি জমিদার-বংশের স্থাপয়িতা।

রামশরণের অধস্তন গঙ্গানন্দ নবাব সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হালদার উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়—জয়নারায়ণ ও

যজ্ঞেশ্বর উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেলবর্ষ পরগণার তরফ কড়ুই নামক জমিদারী পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এতৎসহ নবাব সরকার হইতে তাঁহাদিগকে তলাপাত্র উপাধিও দান করা হয়। ঐ স্থানে তাঁহারা বহু মন্দির নির্ম্মাণ ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি কড়ুই গ্রামে তাঁহাদিগের স্থাপিত শিবদুর্গা ও কালাচাঁদ বিগ্রহ তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী

শ্রীকৃষ্ণ নবাব-সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তখন মুর্শীদকুলী খাঁ নবাব। ইনি কর্ম্মকুশল ছিলেন বলিয়া ইঁহার পদোন্নতি হয় এবং ইনি কানুনগো-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে বঙ্গ-দেশের কোনও জমিদার বিদ্রোহী হন এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপর আদেশ হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে বিদ্রোহী জমিদার ধৃত হন এবং ফলে বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ দিল্লীর বাদশাহের আদেশে নবাব শ্রীকৃষ্ণকে ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারী ও "চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন। এই বিশাল জমিদারী লাভ করিয়া তিনি বোকাইনগরের সন্নিকটে কোনও স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং কখনও এই বাটীতে, কখনও বা কড়ুই গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তদবধি ঐ নবনির্ম্মিত বাটী বাসাবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দুই বিবাহ; প্রথমা পত্নী—সর্ব্বজয়া দেবী এবং দ্বিতীয়া পত্নী—মহেশ্বরী দেবী। সর্ব্বজয়া দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা এবং মহেশ্বরী দেবীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঁদ রায় নবাব সরকারে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করেন। তিনি

চৌধুরী উপাধি

নবাবের তরফে থাকিয়া একটি যুদ্ধ জয়ও করিয়াছিলেন। এই জন্য নবাব তাঁহাকে "রায় রায়ান' উপাধি প্রদান করেন। এই সময়ে ময়মনসিংহ পরগণার জন্য যেরূপ রাজস্ব দিতে হইত তদনুপাতে আয় সেইরূপ ছিল না—আয় কমই হইত। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী দেখিলেন, পুত্রের যোগ্যতায় নবাব সরকার সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। এই সময়ে তিনি জমিদারীর আয়ের হীনাবস্থা নবাবের গোচর করিয়া পুত্রের জন্য জাফরসাহী পরগণা প্রার্থনা করেন। জাফরসাহী পরগণা তখন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল; নবাব সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তখন হইতে জাফরসাহী পরগণার জন্য পৃথক রাজস্ব দিতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর জীবদ্দশাতেই চাঁদ রায়ের পুত্র সোনা রায় এবং পরে চাঁদ রায় ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হরিনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী দুই পক্ষে চারি পুত্র রাখিয়া কড়ইয়ের বাড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইনিই গৌরীপুর জমিদার-বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্রগণমধ্যে কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল হইতে যথাক্রমে রামগোপালপুর ও গৌরীপুর জমিদার-বংশের উদ্ভব হইয়াছে। উঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী ভবানীপুর, গোলকপুর ও বাসাবাড়ী জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথম পক্ষের দুই পুত্র—কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণগোপালের অপর এক নাম গোপালকিশোর। দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্র গঙ্গানারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কড়ইয়ের বাটীতে থাকিতেন। ইঁহাদের চৌধুরী উপাধি থাকিয়া যায়।

প্রথমে চারি ভ্রাতা একত্রই ছিলেন। পরে উভয়পক্ষীয় ভ্রাতৃগণ

পৃথক্ হইলেন। কড়ুই হইতে জমিদারীর পরিচালন সুবিধাজনক নহে বলিয়া প্রথম পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় জাফরসাহীর অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে ও দ্বিতীয় পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় মালঞ্চা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভ্রাতৃবিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। তখন সমস্ত সম্পত্তি তুল্য অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রথম পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় "তরফ রায়" ও দ্বিতীয় পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় "তরফ চৌধুরী" আখ্যায় জমিদারী চালাইতে থাকেন।

জমিদারী-বণ্টন

কনিষ্ঠ কৃষ্ণগোপাল রায় দুই বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দুই পত্নীর কাহারও গর্ভে সন্তান হয় নাই। এজন্য তিনি যুগলকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকিশোরেরও দুই বিবাহ; কিন্তু সন্তান হইবার আশা তখনও ছিল বলিয়া তিনি দত্তক গ্রহণ করেন নাই। প্রথমে কৃষ্ণগোপাল পরলোকগমন করেন। পরে কৃষ্ণকিশোরও অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার অনুগমন করেন। এই সময়ে কৃষ্ণপুর বিশেষরূপ অস্বাস্থ্যকর হইতে আরম্ভ হওয়ায় যুগলকিশোর জ্যেষ্ঠতাতের পত্নীদ্বয়কে লইয়া গৌরীপুরে আগমন করেন এবং তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

গৌরীপুরে আগমন

কৃষ্ণকিশোর রায়ের দুই পত্নী—রত্নমালা দেবী ও নারায়ণী দেবী। ইঁহারা দত্তক রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় যুগলকিশোর রায়ের সহিত ইঁহাদের অসদ্ভাব হয়। এইজন্য ইঁহারা যুগলকিশোরের নিকট হইতে চারি আনা সম্পত্তি পৃথক করিয়া লন এবং রামগোপালপুরে আসিয়া বসবাস করেন। অতঃপর প্রথমা রত্নমালা দেবী দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দত্তক ও রত্নমালা দেবী উভয়েই লোকান্তরে গমন করেন। তখন দ্বিতীয়া নারায়ণী দেবী রামকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ

করেন। এইরূপে গৌরীপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রামগোপালপুর-জমিদার-বংশের উদ্ভব হয়।

যুগলকিশোর রায়চৌধুরী

যুগলকিশোর বুদ্ধিমান, তেজস্বী, দৃঢ়চেতা, পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্ ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। জমিদারী-পরিচালনায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি প্রখরবিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। বলিতে কি, তাঁহার সময় হইতেই গৌরীপুর জমিদারীর উন্নতি আরম্ভ হয়। তিনি সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ এবং সিংধার দস্যু জমিদার দলন করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বোকাইনগরে ৺রাজরাজেশ্বরী কালীমূর্ত্তি এবং দ্বাদশ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিত্য সেবা-পূজার জন্য বার্ষিক আট হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জামালপুরে শ্রীশ্রীরাধামোহন বিগ্রহ ও নেত্রকোণায় একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরও নিত্য সেবার যোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটী পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৌরীপুরে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে তিনি যে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি স্বীয় নামানুসারে যুগলগঞ্জ নামক গ্রাম স্থাপন করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবাগ্নি যাগ করিয়া সমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে, তাঁহার ইঙ্গিতে সমগ্র পরগণা পরিচালিত হইত। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যুগলকিশোর লোকান্তর গমন করেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত যাপুর গ্রামের ভট্টাচার্য্য-বংশের রুদ্রাণী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

হরকিশোর রায়চৌধুরী

যুগলকিশোরের দুই পুত্র ও চারি কন্যা। দুই পুত্রের নাম-হরকিশোর ও শিবকিশোর এবং চারি কন্যার নাম—অন্নদা, বরদা, মোক্ষদা ও মুক্তিদা। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র গঙ্গানারায়ণের একমাত্র পুত্র হরিনারায়ণের পত্নী কালীপুর-নিবাসিনী গঙ্গামণি দেবী শিবকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুগলকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরকিশোর রায়-চৌধুরী পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সময়ে গৌরীপুর জমীদারীর প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি শ্রীহট্ট জেলার প্রসিদ্ধ বংশীকুণ্ডা পরগণা ক্রয় করিয়া স্বীয় জমিদারী-ভুক্ত করেন। গৌরীপুর বাসভবনের সৌন্দর্য্য-সাধনও তাঁহারই সময়ে হয়। তিনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৃকুৎসা গ্রামের কাশীনাথ মজুমদারের কন্যা ভাগীরথী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে একমাত্র কন্যা কৃষ্ণমণি দেবী জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণমণি যখন শিশু সেই সময়ে হরকিশোর রায় চৌধুরী পরলোক গমন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর গৌরীপুর জমীদারী কিছুদিন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল।

খাজুরা-নিবাসী নিরাবিল কুলীন গোবিন্দপ্রসাদ লাহিড়ীর সহিত হরকিশোরের একমাত্র কন্যা কৃষ্ণমণির বিবাহ হইয়াছিল। ভাগীরথী দেবী কৃষ্ণমণির বিবাহের সময় যৌতুকস্বরূপ একটি তালুক দান করিয়াছিলেন। গৌরীপুরের নিকটেই তিনি কন্যা ও জামাতার বাস-ভবন তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছিলেন। কন্যার নামানুসারে উহা কৃষ্ণপুর নামে অভিহিত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদ অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করেন।

হরকিশোরের পত্নী ভাগীরথী দেবী আদর্শ মহিলা ছিলেন। তিনি বহু সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি গৌরীপুরে ৺রাধাগোবিন্দ,

৺গোপালবিগ্রহ, গণেশমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এইসকল বিগ্রহের নিত্যসেবার যে ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত তাহা অটুট আছে। তিনি পতির অনুমতি-অনুসারে গোলকপুরের শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে আনন্দকিশোর নামে অভিহিত করেন। ভাগীরথী দেবী বহু তীর্থ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সাগরসঙ্গম-তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

আনন্দকিশোর রায়চৌধুরী

ভাগীরথী দেবীর জীবদ্দশায়ই তাঁহার দত্তক পুত্র আনন্দকিশোর জমীদারী লাভ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এক-মাত্র নাবালক পুত্র রাজেন্দ্রকিশোরকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। আনন্দকিশোর ভোগ-বিলাসী, আড়ম্বরপ্রিয়, গীত-বাদ্যানু-রাগী ও মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গীতবাদ্য ও আমোদ-উৎসবে গৌরীপুর প্রাসাদ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। গৌরীপুরের বিখ্যাত "পোস্তার দালান" তাঁহার বিলাসবাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। আনন্দকিশোর ছাতিমগ্রাম-নিবাসী শিবকিশোর চৌধুরীর কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। আনন্দকিশোরের অকাল-মৃত্যুর পর ভাগীরথী দেবী কিছুদিন জমীদারীর কার্য্য পরিচালন করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইলে নাবালকের সম্পত্তি বলিয়া গৌরীপুরের জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীন হয়।

রাজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট তারিখে রাজেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতামহীর মৃত্যু হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া

তাঁহার সম্পত্তির পরিচালন-ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ গ্রহণ করেন এবং রাজেন্দ্রকিশোরকে কলিকাতার ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রজারঞ্জক বলিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউর জমিদারী এবং জাফরসাহীতে ইন্দ্রনারায়ণের তালুকের কিয়দংশ ক্রয় করা হইয়াছিল। রাজেন্দ্র-কিশোর সাবালক হইয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার অকাল-মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী জমীদারীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি নিরতিশয় সদনুষ্ঠানশীলা ছিলেন। বহু সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। তিনি ময়মনসিংহ চিকিৎসালয়ে ১৫ হাজার টাকা দান করেন। ময়মনসিংহ জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি অর্থসাহায্য এবং তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর নামে একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিশোরগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি মাসিক সাহায্য করিতেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার-গ্রামনিবাসী হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র রজনীপ্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রজনীপ্রসাদই বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী স্বনামধন্য শ্রীযুত শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গৌরীপুরের স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরেজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ। বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক মুরারিগুপ্তের নিকট

ইনি মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ যন্ত্রবিশারদ দক্ষিণাচরণ ইঁহাকে হারমোনিয়াম ও অন্যান্য যন্ত্রবাদন শিক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রজারঞ্জনের সূচনা

পূর্ব্বে গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের জমিদারী এজমালি অর্থাৎ অবিভক্ত ছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোর জমিদারীর কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই বুঝিলেন যে, প্রজাগণের সুবিধার জন্য এই জমিদারী পৃথক করিয়া লওয়া উচিত। তদনুসারে তিনি বিনা মামলা-মকদ্দমায় আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া এই সম্পত্তি হইতে স্বীয় সম্পত্তি পৃথক করিয়া লন। তদবধি গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের জমিদারী স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতেছে; একের সহিত অপরের কোন সম্পর্ক নাই।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্রজেন্দ্রকিশোর

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সময়ে ব্রজেন্দ্রকিশোর জনমতের সম্মানরক্ষার জন্য বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছিল। স্বদেশের হিতকর বহু অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত কয়েকটী স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত রহিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষার ৫ লক্ষ টাকা দান

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর ইহার পরিচালনকল্পে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ২০ হাজার টাকা; এই টাকাগুলি যাহাতে প্রতিবর্ষে যথাসময়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন।

কৃষি-বাণিজ্যে তাঁহার অসামান্য অনুরাগ। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি মমিনপুরে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন।

কৃষিবাণিজ্যে অনুরাগ

কলিকাতায় কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, সমবায় এবং অন্যান্য স্বদেশী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে তাঁহর বহু টাকা খাটিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু স্বদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশ তিনি ক্রয় করিয়াছেন। দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তিনি বিস্তর অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের বিদ্যোৎসাহিতা এবং দরিদ্র ছাত্রের প্রতি সহানুভূতি অসাধারণ। বহু ছাত্র ইঁহার নিকট হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছে। সংস্কৃত-শিক্ষার্থী দরিদ্র ছাত্রগণকেও তিনি অর্থসাহায্যদানে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

বিদ্যোৎসাহিতা ও ছাত্রগণকে সাহায্যদান।

শিক্ষাবিস্তার-কল্পেও ব্রজেন্দ্রকিশোরের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। তিনি গৌরীপুরে পিতৃনামে রাজেন্দ্রকিশোর উচ্চ ইংরাজী স্কুল এবং ময়মনসিংহের চৌকী ঈশ্বরগঞ্জে তিনি মাতার নামে বিশ্বেশ্বরী উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নেত্রকোণায়ও তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল-প্রতিষ্ঠায় বিশেষরূপ অর্থসাহায্য করিয়াছেন। আরও বহু বিদ্যালয়ে তিনি মাসিক ও বার্ষিক নিয়মিত সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে দান।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সংস্কৃতশিক্ষার বড়ই অনুরাগী। দেশে সংস্কৃতশিক্ষায় প্রচার যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলনে যাহাতে অনুরাগী ও ব্রতী হন, এজন্য তিনি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত। তিনি সংস্কৃতশিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে ৭৫ হাজার টাকা দান করেন। এই টাকায় তিনি বিশ্বেশ্বরী স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপন করেন এবং উপযুক্ত ট্রষ্টিগণ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর এই সদনুষ্ঠানের চালন-

সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার-কল্পে দান।

টোল ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা

ভার অর্পণ করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরী স্মৃতিভাণ্ডারের সুদ হইতে বঙ্গদেশের স্ববৃত্তিস্থ অধ্যাপক পণ্ডিত-মণ্ডলী প্রতিবর্ষে গুণানুসারে ৫০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। সংস্কৃতশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য তিনি গৌরীপুরের সন্নিকট বোকাইনগরে স্থাপিত বিগ্রহ রাজরাজেশ্বরী মহাদেবীর নামে রাজরাজেশ্বরী টোল এবং জামালপুর ও ময়মনসিংহ সহরে বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠী নামক দুইটী টোল স্থাপন করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শাস্ত্রবিশারদ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অধ্যাপকগণের হস্তে এই সকল চতুষ্পাঠীর পরিচালনভার বিন্যস্ত আছে।

কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন ও তাহার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলি-

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ টাকা দান

কাতায় আগমন করিলে ব্রজেন্দ্রকিশোর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সর্ব্বাগ্রে তিনিই তাঁহাকে এজন্য এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-ভাণ্ডারে প্রদান করেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার গৃহনির্ম্মাণ ও কার্য্য পরিচালনের জন্য ব্রজেন্দ্র-কিশোর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার অধীন

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভায় লক্ষ টাকা দান

একটি বেদ-বিদ্যালয় আছে। হিন্দুর সদাচার-রক্ষা, শাস্ত্রের অনুশাসনসমূহের মর্য্যাদা-রক্ষা ও তৎসহ শাস্ত্রশিক্ষার প্রচার, বর্ণাশ্রমরক্ষা ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য। ব্রজেন্দ্রকিশোর এই উদ্দেশ্যগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান্। সেইজন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার উন্নতি ও স্থায়িত্বকল্পে তিনি লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লীতেই সুপেয় পানীয় জলের ও রোগ হইলে চিকিৎসার অত্যন্ত অভাব। এই অভাবের তীব্রতা অনুভব করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁহার স্বর্গীয়া মাতার নামে বিশ্বেশ্বরী ফণ্ড নামক একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার উপস্বত্ব হইতে বগুড়া হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার বিপুল জমিদারীর সর্ব্বত্র প্রতিবর্ষে কূপ, ইন্দারা, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করান হয় এবং জমিদারীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

জলকষ্ট নিবারণ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে দান

বলা বাহুল্য, বিশ্বেশ্বরী স্মৃতিভাণ্ডার ও বিশ্বেশ্বরী ফণ্ডের উপস্বত্ব হইতে এই সকল জনহিতকর কার্য্য যাহাতে বংশ-পরম্পরায় চলিতে পারে তিনি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীনগণ আটপটীতে বিভক্ত থাকায় তাঁহাদের কন্যাগণের বিবাহ-দানে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। ব্রজেন্দ্রকিশোর ইহা লক্ষ্য করিয়া সুসঙ্গের মহারাজ ও তাহিরপুরের রাজা বাহাদুরের সহায়তায় বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন-গণের পটীবিভাগ-সংক্রান্ত আদান-প্রদানের বাধা দূর করিয়া পরস্পরের মধ্যে পুত্র-কন্যার বিবাহের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই বিরাট্ "সমীকরণ"-ক্রিয়ার বিপুল ব্যয়ভার ব্রজেন্দ্রকিশোর বহন করিয়াছিলেন।

কুলীন সমাজে সমীকরণ

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিদা খলসী-নিবাসী কালীপ্রসাদ সান্ন্যাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অনন্তবালা দেবীকে ব্রজেন্দ্রকিশোর বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। প্রথমা কন্যা হেমন্তবালার সহিত রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী এবং দ্বিতীয়া কন্যা বসন্তবালার সহিত

ভিতরবন্দের অন্যতম জমিদার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রকান্ত চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রকিশোরের একমাত্র পুত্রের নাম বীরেন্দ্রকিশোর। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

গৌরীপুর জমিদার-বংশ

বংশলতা।

মৈত্রকুলবীজপুরুষ মতুর ৫ম পুরুষ অধস্তন

১৭ সোল ওঝা
|
১৮ কেশব ওঝা
|
১৯ জীব ওঝা
|
২০ সুধানিধি
|
২১ শঙ্করপাণি
|
২২ শ্রীনিবাস

২৩ রামশরণ (গৌরীপুর-জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা)
|
২৪ শূলপাণি

২৩ দিবাকর (নাটোর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা)

২৫ হরি পণ্ডিত
|
২৬ কেশব আচার্য্য
|
২৭ গঙ্গানন্দ আচার্য্য
|
২৮ জয়নারায়ণ তলাপাত্র
|
২৯ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী

প্রথম পক্ষ — দ্বিতীয় পক্ষ

৩০ চাঁদরায়, কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণগোপাল, কন্যা — ৩০ গঙ্গা, হরি, লক্ষ্মীনারায়ণ

চাঁদরায় (রামগোপালপুর)
|
সোণারায়

কৃষ্ণগোপাল
|
৩১ যুগলকিশোর রায়চৌধুরী (দত্তক)
|
৩২ হরকিশোর — শিবকিশোর

হরকিশোর
|
৩৩ আনন্দকিশোর (দত্তক)
|
৩৪ রাজেন্দ্রকিশোর
|
৩৫ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (দত্তক)
|
৩৬ বীরেন্দ্রকিশোর
|
৩৭ বারীন্দ্রকিশোর (মৃত)



৺মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন দত্ত

পাঠ্যাবস্থা

মধুসূদন দত্ত সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণ বণিক সমাজের প্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভব। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়। কথিত আছে, এই দত্তবংশ শ্রীশ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের বংশসম্ভূত।

মধুসূদন পিতা বদনচাঁদ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা কলুটোলা-নিবাসী নীলমণি দত্ত মহাশয় দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদন বাল্যকালেই মেধার পরিচয় দেন। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া মধুসূদন মহামতি ডেভিড হেয়ার-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। তথা হইতে ক্রমান্বয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন।

তৎকালে কলিকাতার হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ অনাস্থা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আনুরক্তি প্রকাশ করিতেন। মধুসূদন সেই সময়ের লোক হইলেও এবং ইংরাজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা পাইলেও স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হয়েন নাই, অধিকন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস বয়োবৃদ্ধির সহিত দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

মধুসূদন সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভর্ত্তি হয়েন। কিন্তু মাতৃভক্ত মধুসূদন মাতার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া অগত্যা মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করেন। মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করিলে হিন্দুত্ব কলুষিত হইবে—এই ধারণার

বশবর্ত্তী হইয়া মধুসূদনের মাতা পুত্রকে মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করাইলেন।

মধুসূদন শুধু যে অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন তাহা নহে, শারীরিক উন্নতির প্রতিও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি নিত্য ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। তাঁহার উদ্যমে সুরতি বাগানে একটী ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমিতির একটী ব্যায়ামক্ষেত্র ছিল। এই ব্যায়ামক্ষেত্র-সম্পর্কে মধুসূদন একবার দৃঢ়চিত্ততা ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ জমির মালিক ঐ ক্ষেত্রের অতি নিকটে একটী পায়খানা নির্ম্মাণ করেন। মধুসূদন এই পায়খানা একাই ভাঙ্গিয়া দেন।

কর্ম্মজীবন

মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করিয়া মধুসূদন পাঠ্যজীবন শেষ করেন। অতঃপর কর্ম্মান্বেষণে হেয়ার সাহেবের নিকট গমন করিলেন। হেয়ার সাহেব মধুসূদনকে তদীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন সুশিক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন।

মধুসূদন বিশ বৎসর বয়সে কলুটোলার রূপলাল মল্লিক মহাশয়ের কন্যা সরময়ীর পাণিগ্রহণ করেন। মধুসূদন অনুরূপ পত্নী লাভ করিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তৎকালে সমাজে নানারূপে বহিরাকর্ষণ থাকিলেও তিনি পত্নীর প্রতি কদাচ অবিচার করেন নাই এবং আজীবন এক-পত্নী-ব্রততার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মহামতি হেয়ার সাহেব শেষ জীবনে হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ গ্রে সাহেবের ভবনে বাস করিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই হেয়ার

সাহেব পীড়ায় ভুগিতে থাকেন। সর্ব্বদা এদেশীয় লোকদিগের সহিত মিশিতেন বলিয়া ইউরোপীয় কেহই তাঁহার বড় খোঁজ রাখিতেন না। মধুসূদন প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী শিক্ষক ও ছাত্র তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুকালে তাঁহাকে গোর দিবার জন্য কোন সাহেব তাঁহার সৎকারে উপস্থিত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইবা-মাত্র মধুসূদন হেয়ার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। সেদিন অজস্র বারিধারায় কলিকাতার রাস্তা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। শব বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুইখানি গাড়ী উপস্থিত থাকিলেও, হেয়ার সাহেবের ভক্তগণ শব স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মধুসূদন এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। যেহেতু খৃষ্টানের শব বহন করিলে সমাজে যদি উৎপীড়ন ভোগ করিতে হয় এই ভয়ে কেহ কেহ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু মধুসূদন তাঁহার বন্ধুদিগকে সাহস দেন এবং তিনিই অগ্রভাগে স্কন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৃষ্টিধারা তুচ্ছ করিয়া হেয়ারের ভক্তবৃন্দ তাঁহার শব বহন করিয়া হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে লইয়া আসিলেন এবং সেই স্থলেই ঐ শব সমাহিত হইল। প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া হেয়ার যে হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই প্রাঙ্গণে উদারহৃদয় হেয়ারের মর্ম্মর-মূর্ত্তি আজিও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের অশ্রুর সাক্ষ্য দিতেছে। মধুসূদনের উদ্যোগে সমাধি পাকা করিবার জন্য অনেক টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল এবং উদ্বৃত্ত টাকা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

মধুসূদন অতঃপর শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য কোন অর্থকর ব্যবসায়ে যোগদান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শিক্ষকতা করিবার সময়ে তিনি কিছুদিন স্বনামধন্য মতিলাল শীল মহাশয়ের বাটীতে গৃহ-

শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শীলমহাশয়ের পুত্রদিগের বিদ্যার্জ্জনে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই দেখিয়া মধুসূদন ঐ কার্য্য ত্যাগ করেন। প্রায় সেই সময়ে তিনি স্কুলের কার্য্যও ত্যাগ করেন।

তৎকালে কলুটোলার বদনচাঁদ রায় ব্যবসায় দ্বারা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছিলেন। মধুসূদনের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রায়মহাশয় তাঁহাকে স্বীয় সহকারী নিযুক্ত করিলেন। মধুসূদনের পরামর্শে বদনচাঁদবাবু গিস্‌বরণ কোম্পানীর মুৎসুদ্দির পদ গ্রহণ করেন এবং এই সূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। মধুসূদনেরও এই সময় ভাগ্যোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি এতদিন মাসীর বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু এই সময়ে বদনচাঁদ বাবুর বাটীর পার্শ্বস্থ একখানি বাড়ী বিক্রয় হইতেছে শুনিয়া মধুসূদন উহা ক্রয় করেন। বাড়ীখানি দ্বিতল ও তলস্থ ভূমি মাপে সাড়ে বার কাঠা ছিল। বর্ত্তমানে উহা ৩৩নং পিয়ার্স লেন বলিয়া পরিচিত। মধুসূদন জীবনের শেষ-কালাবধি এই বাটীতেই বাস করিয়া গিয়াছেন। উক্ত বাড়ীর পূর্ব্ব নাম ছিল। চন্দ্রবাবুদিগের বৈঠকখানা বাড়ী। ঐ পাড়া তৎকালে মুৎসুদ্দিপাড়া বলিয়া অভিহিত হইত। বলা বাহুল্য, মধুসূদন মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমৃদ্ধির মূলীভূত কারণই এই মুৎসদ্দিপদ। বদনচাঁদ রায় মহাশয় মধুসূদনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে রায় মহাশয় মধুসূদনকে তাঁহার সম্পত্তির অন্যতম ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান।

রায়মহাশয়ের মৃত্যুর পর তদীয় তিন পুত্রের সহিত মধুসূদন উক্ত গিস্‌বরণ কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দির কার্য্য করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে এই কোম্পানীর অফিস উঠিয়া যায়। মধুসূদন তৎপরে রায়মহাশয়ের উক্ত তিন পুত্রের সহিত সুইনি কিলবরণ (যাহা বর্ত্তমানে কিলবরণ কোম্পানী নামে পরিচিত) কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দির

পদে কর্ম্ম করিতে থাকেন। এই কোম্পানীর কারবারে এক বৎসর লোকসান যাওয়ায় মুৎসুদ্দিকে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। ক্ষতিপূরণ করিতে অনেক টাকা আবশ্যক দেখিয়া মধুসূদন উক্ত রায়মহাশয়ের পুত্রত্রয়ের সহিত পাটের বেলারী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতেও বিলক্ষণ ক্ষতি হইল। অতঃপর রায়মহাশয়ের পুত্রেরা আর কারবার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সুতরাং মধুসূদনও অগত্যা তাঁহাদিগের সহিত মুৎসুদ্দিপদ ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু মধুসূদন নিচেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। রায়মহাশয়ের ন্যায় তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পুনরায় কর্ম্মের সন্ধানে ফিরিতে হইল। তিনি একজন মাড়োয়ারী অংশীদার লইয়া ডসন্ অর্‌নিষ্টন কোম্পানী ও ম্যাকনাইট এণ্ডারসন কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দির কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই পদে আরূঢ় থাকিয়া মধুসূদন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মধুসূদন অনেক দীন-দুঃখীর অভাব মোচন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ শুধু যে, তাঁহার পারিবারিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছে তাহা নহে, অনেকের অনেক অভাব তাঁহার অর্থে পূরণ হইয়াছে। মধুসূদন অভাবগ্রস্তের বেদনা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।

কিছুদিন পরে ম্যাকনাইট এণ্ডারসন কোম্পানী গ্লাডিষ্টন ওয়ালি কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং মধুসূদনও উহাদের মুৎসুদ্দি-পদ ত্যাগ করেন। তদবধি মধুসূদন বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সাংসারিক ও ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন।

সত্যনিষ্ঠা

মধুসূদনের সত্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া

আবশ্যক। সুইনি কিলবরণ কোম্পানীর অন্যতম মিঃ স্মিথ কোম্পানীর সংশ্রব ত্যাগ করিয়া টমাস্ ডফ নামে একটী নূতন কারবার স্থাপন করিয়া মধুসূদনকে সমস্ত লোক দিতে অনুরোধ করেন। মধুসূদন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজনাথকে ঐ অফিসের মুৎসুদ্দিপদে নিযুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে শ্রীযুত কেশবলাল পাইনকে ঐ কার্য্য দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; সুতরাং নিজ পুত্রের পরিবর্ত্তে পাইন-মহাশয়কে ঐ পদ দেন। পাইনমহাশয় এখনও ঐ পদে কার্য্য করিতেছেন।

মধুসূদনের ন্যায়নিষ্ঠার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি দশ হাজার করিয়া দুইখানি বিশ হাজার টাকার জীবন-বীমা পলিশি লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া বিশ হাজারের পরিবর্ত্তে কোম্পানীকে একান্ন হাজার টাকা দিয়াছিলেন। জীবন বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কি করিতে হয় তাহা জানেন। মধুসূদন ইহা জানিয়াও টাকা দেওয়া বন্ধ করেন নাই। ইহাতে লোকে হয়ত নির্ব্বোধ বলিবে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে ন্যায়নিষ্ঠ বলিব।

নাগরিক-জীবন

মধুসূদন একাদিক্রমে ৩০ বৎসরকাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনারের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। যে বৎসর গবর্ণমেণ্ট নূতন আইনে কমিশনারগণের ক্ষমতা সঙ্কোচ করেন, সেই বৎসর মধুসূদন-প্রমুখ ২৮ জন কমিশনার ঐ আইনের প্রতিবাদ করেন এবং অকৃতকার্য্য হইয়া কমিশনারের পদে ইস্তফা দেন।

মধুসূদন বহু বৎসর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহার বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন কি স্বীয় সমাজে অনেক সালিশি মামলার বিচার করিয়া উভয়

পক্ষের নিকট ধন্যবাদভাজন হইতেন। মধুসূদন বহুদিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে বিনাবেতনে নিযুক্ত ছিলেন, এই হেতু গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিবারে বিনা পাশে বন্দুক রাখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। মধুসূদন একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। তাঁহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলা যায়। সর্ব্বজীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ। প্রতিবাসীদিগের তত্ত্ব গ্রহণ করা তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। সাংসারিক ব্যবহারে তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। মধুসূদন অলসতার প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি নিজে একজন পরিশ্রমী পুরুষ ছিলেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়াও তিনি অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া অযথা কালক্ষেপ করিতেন না, ধর্ম্মচর্চ্চা অথবা সাংসারিক কার্য্যে বা পরহিতকার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিতেন।

শান্ত চরিত্র

মধুসূদন কখনও বিপদে অধীর হইতেন না বা ক্ষতিতে বিচলিত হইতেন না। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন, অদৃষ্ট মানিতেন সত্য, কিন্তু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে অসীম বল ছিল, শাস্ত্রবাক্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ক্ষতিতে তিনি বিমর্ষ হইতেন না বা লাভে পুলকিত হইতেন না। তাঁহার অচঞ্চল বাহ্যভাব সত্যই অনুকরণীয় ছিল।

পরদুঃখকাতরতা

মধুসূদনের পরদুঃখকাতরতার দুই একটী দৃষ্টান্ত না দিলে তাঁহার জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একদিন মধুসূদন প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে পথ দিয়া একটী বালক যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া জানিলেন যে, বালকটী ব্রাহ্মণসন্তান এবং দুই দিন অনাহারে কাটাইয়া কলিকাতায় নূতন

আসিয়াছে। এই বালকটীর নাম দুর্গাদাস গোস্বামী। মধুসূদন গোস্বামী-কুমারকে স্বীয় বাটীতে লইয়া যাইয়া আহার্য্যাদি-দানে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন এবং কিছুদিন পরে তাহাকে স্বীয় জামাতা বলাইচাঁদ দত্তের এষ্টেটে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। বঙ্কুবিহারী সিং নামক আরও একটী অনাথ রাজপুতবালককে তিনি এইভাবে কুড়াইয়া বাটীতে লইয়া আইসেন। এই বালকটীকে তিনি স্বীয় বাটীতে বাজার-সরকাররূপে রাখেন এবং তাহাকে কিলবরণ কোম্পানীর কলেকটিং সরকার করিয়া দেন। বঙ্কুবিহারী শেষকাল পর্য্যন্ত দত্ত পরিবারে কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী অনাথ বালকে মধুসূদন নিত্য পালন করিতেন। মধুসূদনের নামের সার্থকতার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—একদিন ষ্ট্রাণ্ড রোডস্থিত কিলবরণ কোম্পানীর অফিসের জানালা হইতে মধুসূদন দেখিতে পাইলেন যে, গঙ্গাবক্ষে বৃষ্টি ও তুফানে একখানি যাত্রিপূর্ণ নৌকা নিমজ্জনোন্মুখ হইয়াছে। মধুসূদন এই দৃশ্য দেখিবামাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া বারিবর্ষণ তুচ্ছ করিয়া নদীতীরে ছুটিয়া যাইলেন এবং তীরস্থ মাল্লাদিগকে জানাইলেন যে, ঐ নৌকার যাত্রীদিগকে বাঁচাইতে পারিলে তাহারা প্রত্যেকের জন্য দশ টাকা পুরস্কার পাইবে। মাল্লারা তৎক্ষণাৎ তরঙ্গে ঝম্পদান করিল এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিল। মধুসূদনের এই কার্য্য দেখিয়া অফিসের সাহেবেরা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অফিস হইতে ঐ পারিতোষিকের টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু মধুসূদন তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি স্বীয় অর্থ হইতে সমস্ত পারিতোষিকের টাকা মাল্লাদিগকে অর্পণ করিলেন।

কলুটোলার রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাটীতে যে সুবর্ণবণিক চ্যারিটেবল এসোসিয়েসন আছে, মধুসূদন তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমানে এই এসোসিয়েসন বহু দুঃস্থ সুবর্ণবণিকের ক্লেশ দূর

করিতেছেন। সুবর্ণবণিক-সমাজের এই বিরাট কীর্ত্তির মূলে মধুসূদনের উদ্যম নিহিত আছে।

মধুসূদন শুধু যে দুঃস্থ ও আর্ত্তের পরিত্রাতা ছিলেন তাহা নহে, আত্মীয়স্বজনের দুঃখ-নিবারণেও তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না। তাঁহার শ্বশুর রূপলাল মল্লিক মহাশয়ের বনাতের কারবার ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারবারে লোকসান হওয়ায় কারবারটী উঠিয়া যায়। বৃদ্ধ রূপলাল মৃত্যুমুখে পতিত হন। মধুসূদন এই দুদ্দিনে তাঁহাদের সহায় হইলেন। তিনি শ্বশুরের পরিবার নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি নাবালক শ্যালক দুইটীকে মানুষ করিয়া কর্ম্ম জুটাইয়া দিলেন। তাঁহারা উপার্জ্জনক্ষম হইয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলে মধুসূদন কলিকাতা হাড়কাটা ভিস্তীপাড়ায় একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া তথায় বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া কুটুম্বদের তথায় বাস করাইলেন। তাঁহারা এখনও এই নূতন বাটীতে বসবাস করিতেছেন।

সমাজে প্রতিষ্ঠা

তাৎকালিক সুবর্ণবণিক সমাজে মধুসূদনের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। পশ্চিমদেশীয় সুবর্ণবণিক সমাজে উপবীত-ধারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশে সুবর্ণবণিক জাতি হেয়-পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছে, উপবীত ত দূরের কথা, সুবর্ণবণিক উচ্চ বর্ণের জল-আচরণীয় নহে। শূদ্রবর্ণভুক্ত কোনও কোনও জাতির সহিত তুলনায় যাঁহারা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও যাঁহারা আর্য্যরক্তসম্ভূত, রাজা বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে সমাজে অতি হীন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া যে অবিচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের সময়ে এই সমাজে সংস্কারের আন্দোলন দেখা দেয়। বঙ্গদেশীয় সুবর্ণবণিকগণ উপবীত-গ্রহণের প্রস্তাব কখনও সমর্থন করেন

নাই। অন্যান্যবিষয়ে সকল সংস্কারই মধুসূদনের মনঃপূত হইয়াছিল; উপবীতগ্রহণে মধুসূদনের আপত্তি থাকায় তাৎকালিক সমাজ তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া উপবীত গ্রহণ করে নাই। যদিও বর্ত্তমানে উপবীত-গ্রহণের প্রতি এই সমাজের আকাঙ্ক্ষা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তথাপি আমাদের মনে হয় যে, মধুসূদন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগেও স্বর্ণবণিকসমাজে সেইরূপ অনুভূতির উপযোগিতা আছে।

শুধু সমাজে নহে, পারিবারিক জীবনে বা ব্যক্তিগতভাবে মধুসূদন স্বজাতীয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নৈষ্ঠিক জীবন

মধুসূদন নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া জপতপাদি করিতেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং যাবজ্জীবন শুদ্ধাচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী ছিলেন না। স্বীয় পত্নী ও জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর হস্তের পাক ব্যতীত অপর কাহারও হস্তে তিনি খাইতেন না। নিমন্ত্রণ-বাটীতে তিনি কদাচ ভোজন করিতেন না। আহার্য্য-বিষয়ে তিনি এরূপ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে, বাজার হইতে কদাচ কাটা কুমড়া বা হগ সাহেবের বাজার হইতে কোন ফলমূলাদি তাঁহার বাড়ীতে আসিতে পারিত না। বাজার হইতে ক্রীত দুগ্ধ তিনি কদাচ পান করিতেন না। ধাতুপাত্র ভিন্ন চীনা মাটীর বাসন বা কাচপাত্রে তিনি কখনও আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিতেন না। পারিবারিক জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি কঠোর নিষ্ঠামূলক শাসন প্রবর্ত্তন করিতেন।

মধুসূদন কখনও কোন পীড়াক্রান্ত হয়েন নাই; জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত তিনি স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। জরা তাঁহার দেহ

স্পর্শ করিতে পারে নাই। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার কেশ পক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও দশনপংক্তি শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। মধুসূদন জীবনে কখনও মাদকদ্রব্য সেবন বা ধূমপান করেন নাই। তাহার একমাত্র নেশা ছিল শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ।

গুরুভক্তি ও ধর্ম্মপ্রচার

পণ্ডিত ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় মধুসূদনের অভীষ্টদেব ছিলেন। বৈষ্ণব জগতে গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটীর ৺কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের সংস্কৃত দাতব্য বিদ্যালয় ইঁহারই উদ্যোগে ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধুসূদনের উৎসাহে ও আন্তরিক যত্নে এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রভুপাদ ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই ধর্ম্মমণ্ডল সভায় তৎকালে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। বৈষ্ণব ব্রত সম্বন্ধে সে সময়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য কোন গ্রন্থ না থাকায় নৈষ্ঠিক কর্ম্মে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মধুসূদন এই গোলযোগ দূরীকরণার্থ প্রভুপাদ গোস্বামীমহাশয়কে একটী ব্রততালিকা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে প্রভুপাদ বাৎসরিক বৈষ্ণব ব্রতের একখানি তালিকা রচনা করেন এবং ধর্ম্মমণ্ডল হইতে ঐ পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরিত হয়। অদ্যাপি ঐ ব্রত-তালিকা প্রকাশিত ও বিতরিত হইয়া আসিতেছে।

তীর্থসংস্কার

লুপ্ততীর্থের সংস্কার ও প্রাচীন শ্রীমন্দিরের সংস্কারাদি ব্যাপারেও মধুসূদনের বিশেষ যত্ন ও সহানুভূতি ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ সপ্তগ্রামে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমদুদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাঠে

যে আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে, হুগলীর ৺ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় ও মধুসূদন তাহার প্রথম স্থাপয়িতা। ইঁহাদের চেষ্টায় শ্রীপাঠের জীর্ণোদ্ধার-সাধন, মন্দির-পুনর্গঠন ও সেবাদির বন্দোবস্ত হয়।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়ে। এই প্রস্তরের পুনঃ সংস্থাপন ও মন্দিরের সাধারণ সংস্কার জন্য কলিকাতায় সাহায্যের প্রার্থনা আসিলে তদানীন্তন কলিকাতার ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া মধুসূদন দত্ত ও রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর উপর অর্থসংগ্রহের ভার দেন। রাজকুমারবাবু নামে মাত্র ছিলেন; পরন্তু মধুসূদন একাকীই অল্প সময় মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলেন। ঐ অর্থ তৎপরে পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।

শেষ জীবন

শেষ জীবনে মধুসূদন গৃহে থাকিয়াই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সামাজিক বা পারিবারিক যে কোন বিষয় হইতেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া সর্ব্বদা নাম-গ্রহণে কালাতিপাত করিতেন। পার্থিব বিষয়ে তাঁহার এইরূপ অনাসক্তি গৃহীর পক্ষে নিশ্চয়ই দুষ্কর সাধনা বলিতে হইবে। এই অবস্থায় তাঁহার কক্ষে এত মশা ও ছারপোকার উপদ্রব ছিল যে, অপর লোক কেহ সেখানে একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারিত না। কিন্তু মধুসূদন সে সব গ্রাহ্য করিতেন না। এই অবস্থার সম্যক উপলব্ধি সাধু ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় না।

মধুসূদন ৮৩ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর ১২ দিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ হন। তন্মধ্যে ১০ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন; বাকী ২ দিন গঙ্গাজল ব্যতীত অপর কিছু তিনি পান করেন নাই। তিনি কোন ঔষধ সেবন করেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার



শ্রীযুক্ত পুলীন বিহারী দত্ত

দিব্য জ্ঞান ছিল। যখন তাঁহার গঙ্গাযাত্রা করান হইল, সে দৃশ্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। প্রায় দুই শতাধিক আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত হইয়া মধুসূদন সহাস্যে সকলকে বিদায় জানাইয়া গঙ্গায় চলিলেন। নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে মধুসূদন ১৩০৭ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ বৈকালে গঙ্গা-দর্শনে গমন করেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া তিনি অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে প্রণাম করেন ও গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করেন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকাল গঙ্গায় বাস করিয়া মধুসূদন সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণ বণিক (শাণ্ডিল্য গোত্র)

কুলগুরু

প্রভুপাদ ৺গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী

,, পণ্ডিত ৺ গোকুলচন্দ্র গোস্বামী

,, ,, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন

গঙ্গাহরি দত্ত
|
বঙ্কুবিহারী দত্ত
স্ত্রী—গঙ্গামণি দাসী
|
বদনচাঁদ দত্ত
স্ত্রী—পদ্মাবতী দাসী

* মধুসূদন	কেশবলাল	কন্যা
জন্ম—১২২৫ স্থান চুঁচুড়া মৃত্যু—৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩০৭ স্ত্রী স্বরময়ী জন্ম ১২৩২ মৃত্যু—২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৬	কলুটোলাস্থ নীলমণি চন্দ্রের পোষ্যপুত্র	চুণিমণি বহুবাজার মদন দত্তের গলিস্থ মথুরামোহন দত্তের স্ত্রী

কলুটোলা-নিবাসী রূপলাল মল্লিকের ১মা কন্যা। মাতা হীরামণি কলুটোলা চুণাগলি-নিবাসী বংশীবদন দত্তের কন্যা।

ব্রজনাথ	গোপীনাথ	গোকুলনাথ	বৈকুণ্ঠনাথ	* যদুনাথ
জন্ম—৫ই পৌষ শুক্রবার ১২৪৭, স্থান—কলিকাতা মৃত্যু—২রা শ্রাবণ	জন্ম—১৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১২৫৭ স্ত্রী ভবসুন্দরী	জন্ম—১২৬২ মৃত্যু—১৭ই জানুয়ারী ১৯১৮	জন্ম—২৭শে ভাদ্র বৃহস্পতি ১২৬৯ স্ত্রী রতিমঞ্জরী	জন্ম—১৪ই ভাদ্র বুধবার ১২৭৩ স্ত্রী সরোজিনী



স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র গোস্বামী

শুক্রবার ১৩০৯, কলুটোলা ২য়া স্ত্রী রতি- জন্ম ১৪ই জন্ম ৯ই মাঘ
স্ত্রী লোপামুদ্রা নিবাসী নরসিংহ মুঞ্জরী জোড়া- অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৮০
জন্ম ১২৫৬, মৃত্যু মল্লিকের সাঁকো নিবাসী সোমবার জোড়াসাঁকো
২২শে পৌষ জ্যেষ্ঠা কন্যা বংশীবদন ১২৭৭, তুলা- নিবাসী
সোমবার, ১৩২৫ ২পুত্র ৫কন্যা মল্লিকের কন্যা পটী নিবাসী প্রসাদ দাস
মলঙ্গা নিবাসী ২য়া স্ত্রী কস্তুর চুণিলাল দত্তের ৪র্থা
লোকনাথ ধরের মুঞ্জুরী জোড়া- সেনের ৩য়া কন্যা, ৬পুত্র
৩য়া কন্যা, মাতা নৃত্যমণি সাঁকো নিবাসী কন্যা ১ পুত্র ৫ কন্যা
হরিদাস শীলের ২ কন্যা
৪র্থা কন্যা ৩পুত্র ১ কন্যা

পুলিনবিহারী

* রাসবিহারী

জন্ম—২৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১২৭৬, স্থান—কলিকাতা
স্ত্রী শৈবলিনী, জন্ম—২৪শে কার্ত্তিক শনিবার ১২৮৫
আমড়াতলা গলি নিবাসী উদয়চাঁদ আঢ্যের পুত্র কার্ত্তিকচরণ আঢ্যের
২য়া কন্যা, মাতা ব্রজসুন্দরী তুলাপটী নিবাসী মণিলাল সেনের কন্যা,
মৃত্যু—২রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩২৬।

পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা
রাধাশ্যাম	তারকদাসী	রাইকিশোরী	কৃষ্ণমতি
জন্ম—১৩০২	জন্ম—২৫শে শ্রাবণ	জন্ম—১৯শে কার্ত্তিক	জন্ম—২৯শে
মৃত্যু—১৩০৮	বুধবার ১৩০০।	বৃহস্পতিবার ১৩০৪,	অগ্রহায়ণ
	রামবাগান নিবাসী	আহিরীটোলা নিবাসী	বৃহস্পতিবার
	ক্ষেত্রমোহন সেনের	গিরিশচন্দ্র চন্দ্রের	১৩০৬ হাড়কাটা

২য় পুত্র যুগলকিশোর সেনের স্ত্রী, যুগলের জন্ম ১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৮৯ বিবাহ—১১ই মাঘ সোমবার ১৩১০। দুই কন্যা

৩য় পুত্র শরৎচন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী বিবাহ ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩১৫।২ পুত্র ৩ কন্যা

গলি নিবাসী ব্রজনাথ ধরের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয় লাল ধরের স্ত্রী, প্রিয়লালের জন্ম ২রা পৌষ রবিবার ১২৯০, বিবাহ ২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩০৮ ৩ পুত্র ২ কন্যা।

* রাসবিহারী

জন্ম—৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১২৭৮, স্থান—কলিকাতা

স্ত্রী কাত্যায়নী

জন্ম—১২৮৮। মৃত্যু—ভাদ্র ১৩১৬। আহিরীটোলা নিবাসী কালীকৃষ্ণ ধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাসবিহারী ধরের একমাত্র কন্যা

পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা
গোরাচাঁদ	নন্দেরচাঁদ	শ্রীমতি	ললিতা
জন্ম ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩০৭। স্ত্রী সত্যবতী জয়মিত্র গলিস্থ উপেন্দ্র নাথ দত্তের অষ্টমা কন্যা বিবাহ ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩০	জন্ম ২রা পৌষ রবিবার ১৩১২	জন্ম ১৬ই শ্রাবণ রবিবার ১৩০৫ সারপেণ্টাইন লেন নিবাসী নন্দলাল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুগলকিশোর সেনের স্ত্রী, যুগলের জন্ম ১৭ই	জন্ম ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩১০। হুগলী নিবাসী প্রসাদ দাস বড়ালের পুত্র যতীন্দ্রনাথ বড়ালের স্ত্রী, যতীন্দ্রের জন্ম



প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন।

ফাল্গুন, শনিবার ১২৯৭, ২২শে অগ্রহায়ণ
বিবাহ ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার ১২৯২,
সোমবার, ১৩১৫ বিবাহ ৩রা শ্রাবণ
২ পুত্র ৩ কন্যা রবিবার ১৩২১
১ পুত্র ১ কন্যা

মধুসূদন ঃ

কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
বঙ্গণময়ী	লক্ষ্মীমণি	পূর্ণামণি	মুঞ্জরী
জন্ম— ৫ই ভাদ্র বুধবার ১২৫২ বহুবাজার নিবাসী বলাইচাঁদ-দত্তের স্ত্রী ৪ পুত্র ৪ কন্যা	জন্ম— ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১২৫৫ জোড়াসাঁকো নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের স্ত্রী ১ পুত্র ৪ কন্যা	জন্ম—১২৬৪ ঝামাপুকুর শ্রীদামচন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী ৪ পুত্র ৫ কন্যা	জন্ম—১২৭৭ মৃত্যু—২১শে ১৩২৮, সুরতি-বাগান নিবাসী নিতাইচাঁদ মল্লিকের স্ত্রী ৩ পুত্র ৩ কন্যা

বেলেঘাটার সরকার বংশ

কলিকাতা বেলেঘাটার সরকার বংশ অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি বংশ। ইঁহারা কাশ্যপ-গোত্রীয় দেববংশ। জাতিতে ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺রামচরণ সরকার ও ৺গগনচন্দ্র সরকার যশোহর ঝিনাইদহের সন্নিকটস্থ দুর্গাপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া অনুমান ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলেঘাটার পূর্ব্বপ্রান্তে বনজঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ তথায় বসবাস করিতে থাকেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় বেলেঘাটা বনজঙ্গল ও হিংস্র শ্বাপদ জন্তুসকলের হাত হইতে মুক্ত হইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরতলীতে পরিণত হয় এবং তাঁহাদের চেষ্টায় উক্ত অঞ্চলে লোকজন বসবাস করিতে থাকেন। ৺গগনচন্দ্র সরকার মহাশয়ই কলিকাতার সন্নিকটস্থ ধাপার জলকর ভেড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। ৺রামচরণ সরকার মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার জীবিত আছেন। বর্ত্তমানে ইঁহারা ৬৯ নং বেলেঘাটা মেন রোডস্থ পৈত্রিক ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বাটীতে এখনও পিতৃপিতামহের আমল হইতে প্রচলিত বার্ষিক শ্রীশ্রী৺ দুর্গাপূজা, ৺কালীপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্ব্বণ হইয়া আসিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন ১৩০৭ সালে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন এবং তাহার পাঁচ বৎসর পরে গগনচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তদবধি সুরেন্দ্রনাথের উপর জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বেই তাহা রক্ষণাবেক্ষণ হইতে থাকে। গগনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং কন্যা শ্রীমতী হরিদাসী।

৺রামচরণ সরকারের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীর সহিত



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার।

হালিসহর কোনানিবাসী ৺রায় হরিশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র ৺আভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। সুহাসিনী দেবীর একমাত্র পুত্র ও একটী কন্যা—নাম সুনীলকুমার ও কল্যাণী।

গগনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হরিদাসী দেবীর সহিত রায় বাহাদুর ৺দীনবন্ধু মিত্রের পরিবারস্থ ৺বিপিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ৺প্রকাশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে হরিদাসীর এক পুত্র ও তিন কন্যা। কন্যা তিনটিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

২৪ পরগণার মধ্যে ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় প্রথমে এই জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এখন তিনি অবকাশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও পূজানুষ্ঠানে সময়াতিপাত করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতাদি ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি নানা রাগ-রাগিণীতে বিশেষ অধিকার আছে। তিনি সুকণ্ঠ। এক্ষণে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় জমীদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। জনহিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি আছে। ইঁহারা সকলেই একান্নভুক্ত। ইঁহারা বেলিয়াঘাটা মেন রোডে একটি শীতলা দেবীর মন্দির করিয়া দিয়াছেন, কালীমাতার একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিধুবাবু বহুকাল ধরিয়া মাণিকতলা মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলর, শিয়ালদহের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন এবং কলিকাতা ইন্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কো-অপ্ট সভ্য ও লাইসেনসিং বোর্ডের সভ্য ছিলেন। বিধুবাবু ও গণপতি বাবুদিগের চেষ্টায় "বেলেঘাটা লাইব্রেরী" স্থাপিত হইয়াছে। বিধুবাবুর 'পুষ্পবাণবিলাসে'র অনুবাদ ও 'আসলে মেকি' (প্রহসন) প্রভৃতি পুস্তক আছে। সম্প্রতি ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস অবলম্বনে "রাজসিংহ" নামক একখানি সুন্দর নাটক লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র জাতির সমগ্র ইতিহাস-অবলম্বনে ইনি "মহারাষ্ট্র

জাগরণ" নামক আর একখানি মনোহর নাটক লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাহার রচিত "কৌরবগণের গুরুদক্ষিণা" নামক পৌরাণিক নাটকও আছে। বর্ত্তমান সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি লইয়া "কর্ম্ম রহস্য" নামক এক অপূর্ব্ব নাটক আছে। তিনি "রামায়ণ" (নাটক) এবং "গোগৃহ" কাব্য লিখিয়াছেন, পণ্ডিতমণ্ডলী ও সংবাদপত্র তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার লেখা অতি সুন্দর।

"বেলেঘাটা লাইব্রেরীতে" ইহঁার সকল নাটকগুলিরই অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ইনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় দুইবার "কায়স্থ-পত্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক-পদে বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায়ও ইনি কয়েক বৎসর কাল সহযোগী সম্পাদকও ছিলেন এবং এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কোষাধ্যক্ষ। ইনি কালিদাসের "ঋতুসংহার" কাব্যের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার "জ্যোতিষ-যোগতত্ত্ব" নামক পুস্তক ফলিত জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠ পুস্তক। ইহা ছাড়া হিন্দুর নিত্যকর্ম্ম ও পূজার্চ্চনারও অনেকগুলি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে "যজুসংস্কার পদ্ধতি", কালিকা পুরাণোক্ত "দুর্গাপূজা পদ্ধতি", "শ্রাদ্ধপদ্ধতি" "উপনয়ন-সন্ধ্যা তর্পণ পূজা-প্রয়োগ" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ' নামক পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করিয়া ও নানা শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক দিয়া 'বিধবা বিবাহ ও হিন্দু ধর্ম্ম" নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন পুরুষ চিত্রগুপ্তের পূজার পদ্ধতি নিরূপণ করিবার জন্য ইনি "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা-পদ্ধতি" নামক একখানি পুস্তকের সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া

"রসনির্ঝর" নাম দিয়া প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিগণের উদ্ভট শ্লোকের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। "কামন্দকীয় নীতিসার" নামক প্রাচীন রাজ-নীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকের অনুবাদ করিয়া ইনি বঙ্গীয় জাতীয় সাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। মহাকবি ভাসের "মধ্যম ব্যায়োগ" নামক সংস্কৃত নাটক-অবলম্বনে "মধ্যম রহস্য" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়াছেন এবং শুক্রনীতিরও অনুবাদ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইনি "রাসলীলা" "শিলালিপি" প্রভৃতি নানা-বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ছাড়া "এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে"ও ইঁহার লিখিত প্রত্নতত্ত্বমূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নানা পত্রিকায় ইঁহার নানাবিষয়ক প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া থাকে। অনেক প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া এবং অনেক লুপ্ত প্রত্নতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। কলাবিদ্যায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি সুকবি। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৩৮ বৎসর মাত্র।

বেলেঘাটার সরকার বংশ

